ইতিবৃত্ত

প্রথমবর্ষ, ২০২৬

আনন্দ মোহন কলেজের ইতিহাস বিভাগের গবেষণা ও সৃজনশীলতা বিষয়ক একটি বার্ষিক প্রকাশনা

ইতিহাস বিভাগ
আনন্দ মোহন কলেজ
কলকাতা

আনন্দ মোহন কলেজের ইতিহাস বিভাগের বার্ষিক প্রকাশনা

প্রথমবর্ষ, ২০২৬–২০২৭

ইতিবৃত্ত

ইতিবৃত্ত
বার্ষিক পত্রিকা
প্রথমবর্ষ
প্রকাশকাল ৯ই জুলাই ২০২৬

©আনন্দ মোহন কলেজ

প্রকাশক:

আনন্দ মোহন কলেজ

রাজা রামমোহন সরণী

কলকাতা ৭০০০০৯

প্রাককথন

"কলকাতা আছে কলকাতাতেই, দেখতে দেখতে কত কিছু গেছে পাল্টে..."অঞ্জন দত্তের গানের এই কথাগুলো যেন এই শহরের চিরন্তন সত্যি। যুগের পর যুগ ধরে চারপাশের কত কিছুই তো বদলে যাচ্ছে, কিন্তু শহরের সেই নিজস্ব প্রাণবন্ত রূপ আর নস্টালজিয়া আজও একই রকম অমলিন। কলকাতার এই অপরিবর্তিত আত্মার কারণগুলো কিন্তু শহরের পরতে পরতেই লুকিয়ে আছে ইতিহাস ও ঐতিহ্য: পুরোনো স্থাপত্য, টানা রিকশা, গঙ্গার ঘাট আর রাস্তার মোড়ে মোড়ে লুকিয়ে থাকা শতকের গল্পগুলো আজও শহরটাকে তার শিকড়ের সাথে বেঁধে রেখেছে। আড্ডা ও সংস্কৃতি: পাড়ার মোড়ের চায়ের দোকান থেকে শুরু করে কফি হাউস—সব জায়গাতেই চায়ের ভাঁড়ে ঝড় তোলা সেই পুরোনো আড্ডার মেজাজ আজও অটুট। আন্তরিকতা: হাজারো ব্যস্ততা আর আধুনিকতার ইঁদুর দৌড়ের মাঝেও মানুষের একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর স্বভাবটা কলকাতা হারায়নি। সময় বদলাচ্ছে, নতুন নতুন ফ্লাইওভার আর শপিং মল তৈরি হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু নিজের পুরোনো চালচিত্র আর ঐতিহাসিক মেজাজটাকে সযত্নে আগলে রেখেই কলকাতা আজও কলকাতাতেই আছে।

সূচীপত্র

শুভেচ্ছা বার্তা

ড. দেবর্ষি ভট্টাচার্য, অধ্যক্ষ, আনন্দ মোহন কলেজ ৭
ড. আত্রেয়ী মুখার্জি, আইকিউএসি (IQAC) কো-অর্ডিনেটর, আনন্দমোহন কলেজ ৮
সম্পাদকীয় ৯
শ্রদ্ধাঞ্জলি ১০

প্রবন্ধ

ড. কাকালী সিনহা, প্রসঙ্গ ক্ষীরপাই ও তার বিবর্তন ১৫
তীর্থ রায়, রাখিগড়ীর হরপ্পীয় সমাধিক্ষেত্র: অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সংক্রান্ত প্রথা ও আচরণ ১৯
সুজল দাস, ভয়নিক পাণ্ডুলিপি: শতবর্ষ-প্রাচীন ধাঁধার প্রথম অনুমোদিত অনুলিপি ২১
Larka Biswas, History: Understanding the Past, Shaping the Future ২৪
Md. Zaid, Mystery behind Egypt's Pyramids ২৬
মিলন রায়, শিক্ষায় প্রান্তজন: উপেক্ষা, প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণ ২৮
স্মৃতিচারণ ৪০
Abhisek Das, Alumnus, More Than a Teacher 1 ৪২
MD Sarfialam, More Than a Teacher 2 ৪৩
ফিরে দেখা ৪৫
শিক্ষামূলক ভ্রমণ ৪৬
ছবিতে ইতিহাস ৪৭

সম্পাদকীয়মণ্ডলী

সম্মাননীয় সম্পাদক: সেলিনা জাহান, সহযোগী অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, আনন্দ মোহন কলেজ

প্রধান সম্পাদক: মিলন রায়, সহকারী অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান, ইতিহাস বিভাগ, আনন্দ মোহন কলেজ

সহকারী সম্পাদক: ড. কাকলি সিংহ, সহযোগী অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, আনন্দ মোহন কলেজ

অধ্যক্ষ মহাশয়ের শুভেচ্ছা বার্তা

প্রতিটি সূর্যোদয়ই আপাত শান্ত, অচঞ্চল, শব্দহীন। অথচ সেই উদিত সূর্যের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে উদ্ভাসিত হয় আশ্চর্য সুন্দর আলোক কিরণ। আনন্দ মোহন কলেজের ইতিহাস বিভাগ দ্বারা প্রকাশিত ‘ইতিবৃত্ত’ আজ হয়তো প্রথম, কিন্তু অমোঘ সময়ের ধারা বেয়ে নিযুত পরিত্যক্ত দরজা উন্মুক্ত করে ঠিক একদিন প্রকৃত ইতিহাসের অন্তহীন প্রবাহে প্লাবিত করবে অসংখ্য ইতিহাস পিপাসু মনন। আজ যা কাঁপতে থাকা তিরতিরে চারাগাছ, একদিন তা প্রকাণ্ড মহীরুহ হয়ে ওঠার প্রমাদ গুনছে বলেই আমার বিশ্বাস। আনন্দ মোহন কলেজের ইতিহাস বিভাগের সাথে যুক্ত সকলের নিরলস পরিশ্রমের নীট ফল হল ইতিবৃত্তের আত্মপ্রকাশ। অফুরান শুভেচ্ছা রইলো টিম ইতিবৃত্তের জন্য।

আমি আনন্দ মোহন কলেজের ইতিহাস বিভাগ দ্বারা প্রকাশিত ‘ইতিবৃত্ত’ পত্রিকার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি এবং গুণগত মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি সর্বান্তকরণে কামনা করছি।

ডঃ দেবর্ষি ভট্টাচার্য

অধ্যক্ষ, আনন্দ মোহন কলেজ

আইকিউএসি (IQAC) কো-অর্ডিনেটর, ড. আত্রেয়ী মুখার্জির শুভেচ্ছাবার্তা

‘ইতিবৃত্ত’আনন্দ মোহন কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রথম প্রকাশিত গবেষণা ও সৃজনশীলতা বিষয়ক একটি বার্ষিক পত্রিকা। বিভাগের শিক্ষক - শিক্ষিকা মন্ডলী, ছাত্র ছাত্রী দের এই অভিনব প্রয়াসকে স্বাগত জানাই । এই পত্রিকা ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে যেমন তাদের বিষয় সম্পর্কে আগ্রহ জাগ্রত করবে তেমনি তাদের অনুসন্ধিৎসু পিপাসা বৃদ্ধি করবে ও সৃজনশীলতাকে প্রাণিত করবে। ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায় আমাদের গর্বিত করে, আমাদের সংস্কৃতি কে ঋদ্ধ করে। সমাজ, দেশ ও কালের নিরিখে ইতিহাস এক প্রামাণ্য দলিল যা আমাদের নতুন প্রজন্মকে তিলে তিলে গড়ে ওঠা সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে এবং এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিশা দেখাতে সাহায্য করে। ইতিহাস এমন একটি বিষয় যা সব বিষয়ের গোড়ার কথা । তাই শুধুমাত্র পাঠ্য ও পঠিত বিষয়ে সীমাবদ্ধ না থেকে এই পত্রিকায় দেশ, সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের সঠিক ইতিহাস প্রকাশিত হোক যা আগামী দিনে ছাত্র ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় উৎসাহিত করতে সাহায্য করবে।

ড. আত্রেয়ী মুখার্জি
আইকিউএসি (IQAC) কো-অর্ডিনেটর,
আনন্দ মোহন কলেজ

সম্পাদকীয়

“ওরাই রাখে জ্বালিয়ে শিখা বিশ্ববিদ্যা শিক্ষালয়ে,
অন্নহীনে অন্নদিতে ভিক্ষামাগে লক্ষী হয়ে;”

আমাদের বিভাগীয় পত্রিকার প্রথম সংস্করণে আপনাদের স্বাগতম। ইতিহাস প্রতিদিনের জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে রচিত হয়; এটি কেবল নথিপত্র বা আর্কাইভেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং আমাদের চারপাশের গ্রামীণ স্থাপত্য, রণনৃত্য এবং লোকশিল্পের মধ্যেও তা বিদ্যমান। আনন্দমোহন কলেজের ইতিহাস বিভাগের নিজস্ব পত্রিকা—‘ইতিবৃত্ত’ (Itibritta)—প্রকাশ করতে পারা আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। এই উদ্বোধনী সংখ্যাটি একাধিক বিভাগে বিন্যস্ত, তবে ভবিষ্যতে এর গঠন বা পরিসর পরিবর্তিত বা সম্প্রসারিত হতে পারে। এই সংখ্যায় আমাদের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি ইতিহাস বিভাগের বর্তমান শিক্ষার্থী ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের লেখা প্রবন্ধও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা পত্রিকাটির জন্য এক মূল্যবান সংযোজন হয়ে উঠেছে। ‘স্মৃতিকথা’ (Reminiscences) ও ‘শ্রদ্ধাঞ্জলি’ (Tributes)—এই দুটি বিভাগেযারা ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব ফেলেছে এমন কিছু প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বের কথা তুলেধরা হয়েছে। আলোকচিত্র বিষয়ক শেষ অংশটি পরিপূরক হিসেবে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। অত্যন্ত সীমিত সময়ের মধ্যে ম্যাগাজিনটি প্রকাশের কারনে বেশ কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলত্রুটি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে গেছে। এই ত্রুটিগুলোর জন্য আমরা আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী। পরবর্তী সংস্করণে এ বিষয়ে আমরা আরও সতর্কতা অবলম্বন করব। আপনাদের মূল্যবান মতামত ও গঠনমূলক সমালোচনা আমাদের পথ দেখাবে।

সেলিনা জাহান
মিলন রায়
ড. কাকলি সিংহ

বিখ্যাত উক্তি

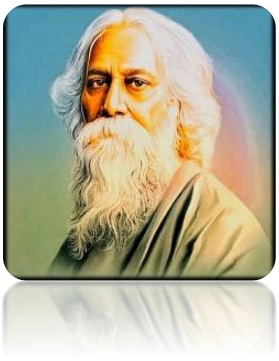

শিক্ষা জিনিসটা তো জীবনের সঙ্গে সংগতিহীন একটি কৃত্রিম জিনিস নহে। আমরা কী হইব এবং আমরা কী শিখিব এই দুটি কথা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন।”

“অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না - বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়া যায়।”

“বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোনোমতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশলাভ হয় না।”

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

“মনকে রাশি রাশি তথ্য দিয়ে ভরে রাখার নাম শিক্ষা নয়। মনরূপ যন্ত্রটিকে সুষ্ঠুতর করে তোলা এবং তাকে সম্পূর্ণ বশীভূত করা এই হল শিক্ষার আদর্শ।”

“যাতে চরিত্র তৈরী হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, এইরকম শিক্ষা চাই।”

- স্বামী বিবেকানন্দ

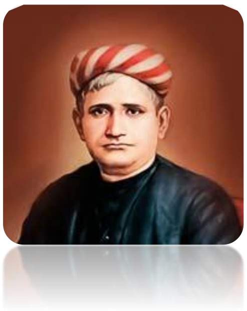

“রাজার অপেক্ষাও, যাঁহারা সমাজের শিক্ষক, তাঁহারা ভক্তির পাত্র।... যাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধি বলে, পরিশ্রমের সহিত সমাজের শিক্ষায় নিযুক্ত, তাঁহারাই সমাজের প্রকৃত নেতা, তাহারাই যথার্থ রাজা।”

"শিক্ষক এবং শিক্ষা ভিন্ন কখনই মনুষ্য মনুষ্য হয় না। সকলেরই শিক্ষকের আশ্রয় লওয়া কর্তব্য।”

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

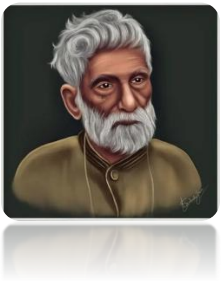

“আমরা বাল্যকাল হইতেই উপরচালাকি বা ফাঁকিদারি দ্বারা কাজ ফতে করিতে চাই। রীতিমত পরিশ্রম করিয়া বিদ্যার্জন করা যেন এখন রেওয়াজের বাইরে।... কোন শিক্ষক বা অধ্যাপক যদি একটু বেশি রকমের ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইলে ছেলেরা অধৈর্য হইয়া উঠে এবং সে অধ্যাপক অপ্রিয় বা ছাত্রদের বিরাগভাজন হইয়া উঠেন।... যে শিক্ষক যত নোট দিতে পারেন তিনি ছাত্রসমাজে তত প্রশংসার ভাজন হন। এইরূপেই গোড়াতেই কাঁচা থাকার দরুণ প্রকৃত শিক্ষা হয় না।”

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

শ্রদ্ধাঞ্জলি

২০২৬

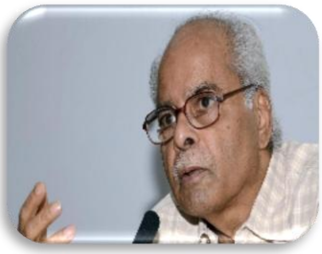

- **কে. এন. পানিক্কর** (২৬ এপ্রিল, ১৯৩৬ – ৯ মার্চ, ২০২৬) ছিলেন একজন বিশিষ্ট ভারতীয় ইতিহাসবিদ ও জন-বুদ্ধিজীবী, যিনি ইতিহাস রচনার মার্কসীয় ধারার সাথে যুক্ত ছিলেন। ঔপনিবেশিক ভারতের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ওপর তাঁর কাজের জন্য তিনি ব্যাপকভাবেসমাদৃত এবং আধুনিক ভারতীয় ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব।

- **শিরিন রত্নগর** (১৯৪৪ – ২৫ মে, ২০২৬) ছিলেন ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক, যিনি সিন্ধু উপত্যকা (হরপ্পা) সভ্যতার ওপর যুগান্তকারী গবেষণার জন্য সুপরিচিত। প্রাচীন দক্ষিণ এশিয়াকে বিচ্ছিন্ন কোনো সত্তা হিসেবে দেখার পরিবর্তে তিনি এমন এক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন করেন, যা হরপ্পাবাসীদেরব্রোঞ্জ যুগের এক গতিশীল ও পারস্পরিক সংযোগযুক্ত বিশ্বের অংশ হিসেবে উপস্থাপন করে; তাঁর এই গবেষণায় বাণিজ্য, রাষ্ট্র গঠন, শ্রম-সংগঠন এবং পরিবেশগত চাপের বিষয়গুলোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

২০২৫

- **রজত কান্ত রায়** (৬ মে, ১৯৪৬ – ৬ আগস্ট, ২০২৫) ছিলেন দক্ষিণ এশিয়ার একজন বিশিষ্ট ভারতীয়ইতিহাসবিদ, যিনি আধুনিক ভারতের ইতিহাসের ওপর তাঁর অগ্রগামী গবেষণার জন্য সমাদৃত। ঔপনিবেশিক বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আবেগ-কেন্দ্রিক ইতিহাসের ওপর বিশেষ পারদর্শী রজত কান্ত রায় ঔপনিবেশিক আমলের মানসিকতা, চিন্তাধারা ও দেশজ ঐতিহ্যের ওপর আলোকপাত করে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে গবেষকদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন।

- **চিত্তব্রত পালিত** (১৮ অক্টোবর, ১৯৪১ – ১৩ জুন, ২০২৫) ছিলেন একজন বিশিষ্ট ভারতীয় ইতিহাসবিদ এবং ঔপনিবেশিক বাংলার কৃষি-ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে এক অগ্রগামী ব্যক্তিত্ব। অর্থনৈতিক ইতিহাসের পাশাপাশি, ঔপনিবেশিক যুগে দেশীয় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও চিকিৎসা পদ্ধতির ইতিহাসের ওপর তাঁর ব্যাপক গবেষণার জন্যও তিনি ব্যাপকভাবে সমাদৃত ছিলেন।

২০২৪

- **আর. চম্পকালক্ষ্মী** (১৯৩২ – ২৮ জানুয়ারি, ২০২৪) ছিলেন একজন অত্যন্ত বিশিষ্ট ভারতীয় ইতিহাসবিদ, শিলালিপি-বিশেষজ্ঞ এবং প্রাচীন ও প্রারম্ভিক মধ্যযুগীয় দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসের গবেষক। উপদ্বীপীয় ভারতে নগরায়ণ, রাষ্ট্র গঠন এবং ধর্ম, বাণিজ্য ও রাজনৈতিক ক্ষমতার মধ্যকার জটিল সম্পর্কের বিষয়ে তাঁর যুগান্তকারী গবেষণার জন্য তিনি সর্বাধিক পরিচিত।

২০২৩

- **রণজিৎ গুহ** (২৩ মে, ১৯২২ – ২৮ এপ্রিল, ২০২৩) ছিলেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রভাবশালী ইতিহাসবিদ এবং ‘সাবঅল্টার্নস্টাডিজ গ্রুপ’-এর প্রতিষ্ঠাতা। দক্ষিণ এশীয় ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দুকে ঔপনিবেশিক অভিজাত ও জাতীয়তাবাদী নেতাদের পরিবর্তে কৃষক, আদিবাসী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সক্রিয় ভূমিকার দিকে সরিয়ে আনার মাধ্যমে তিনি এক গভীর ও যুগান্তকারী পরিবর্তন (প্যারাডাইমশিফট) সূচনা করেছিলেন, যার প্রভাব ইতিহাস, উত্তর-ঔপনিবেশিক ও সাংস্কৃতিক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল।

প্রবন্ধ

১

প্রসঙ্গ ক্ষীরপাই ও তার বিবর্তন

ড. কাকলি সিংহ

সহযোগী অধ্যাপিকা
ইতিহাস বিভাগ
আনন্দ মোহন কলেজ

ক্ষীরপাই নামটি কিভাবে এলো সেই সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। শোনা যায় শ্রী চৈতন্যদেব জাহানাবাদ (বর্তমান আরামবাগ) হয়ে পুরী যাবার সময় ক্ষীরপাইয়ের অস্থলে(বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নাম গানের আখড়া) অবস্থান করেছিলেন।সেই সময় তিনি ভক্তদেরকে সহস্তে বানানো ক্ষীর বিতরণ করেছিলেন। সেই থেকে স্থানটির নাম হয় ক্ষীরপাই। এই অঞ্চলটি কেথাই ও শিলাবতী (kethai, shilaboti) নদীর তীরে অবস্থিত এখানে চাঁদ সদাগরের কাহিনী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা, সূর্য কুমার অগস্তির কথা,এন্টনি ফিরিঙ্গির যজ্ঞেশ্বর কবিয়ালের(জগা কবিয়াল) এর গান-"জাড়া গোলক বৃন্দাবন" মানুষের মুখে মুখে ফেরে। ক্ষীরপাই এর দশ নম্বর ওয়ার্ডে বিষ্ণুপুরের আদলে নির্মিত পোড়ামাটির উমাপতিনাথের মন্দিরটি বেশ বিখ্যাত। এখানে প্রতিবছর গাজনের সময়একশোর উপর ভক্ত হয়।

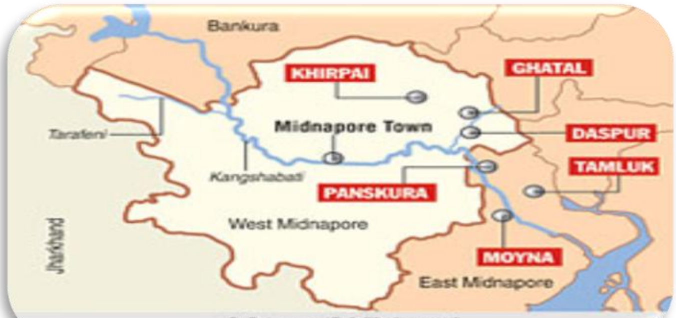
Bankura
KHIRPAI
GHATAL
Midnapore Town
DASPUR
Tarafeni
TAMLUK
Kangshabati
PANSKURA
West Midnapore
Jharkhand
MOYNA
East Midnapore

Map of Khirpai

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার চন্দ্রকোনা থানার মধ্যে ক্ষীরপাই একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প সমৃদ্ধ জনপদ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। ঐতিহাসিকভাবে ক্ষীরপাই এর নাম রেনেলের মানচিত্রে পাই। এই মানচিত্রে ক্ষীরপাইকে একটি নদী বন্দর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৭৭৯ সালে The Map of Bengal and Bihar মানচিত্রে সার্ভেয়ার জেমস রেনেল দুটি পথ দেখিয়েছেন একটি রাজমহল অন্যটি মালদহ মালদহ পথটি বাদশাহী সড়ক। এই সড়কের একটি অংশ মুর্শিদাবাদ থেকে পলাশী হয়ে বর্ধমান, আরামবাগ,ক্ষীরপাই ও মেদিনীপুরের উপর দিয়ে ওড়িশা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[১] মেদিনীপুর থেকে ক্ষীরপাই পর্যন্ত রাস্তাটিকে হান্টার সাহেব একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বলে উল্লেখ করেছেন।[২] ১৭৪০ থেকে ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভাস্কর পন্ডিতের নেতৃত্বে মারাঠারা বর্ধমান, মেদিনীপুর, খড়গপুর, খড়ার, ক্ষীরপাই চন্দ্রকোনা ইত্যাদি স্থানে লুটপাট ও নারীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করে। গঙ্গারাম রচিত মহারাষ্ট্র পুরাণেবর্গীদের এই অত্যাচারের কাহিনী কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপ --

কারু হাত কাটে কারু কাটে নাককান।
একি চোটে কারু বধ এ পরান।
তবে কোন গ্রাম বরগী দিল পোড়াইয়া।
সেই সময় গ্রামের নাম শুনো মনো দিয়া।।
চন্দ্রকোনা মেদিনীপুর আর দিখগপুর।
খীরপাই খোড়ার আর বদদমান সহর।।
নিমগাছি সেড়গাঁ আর সীমইলা।
চন্ডিপুর শ্যামপুর গ্রাম আনাইলা।।
এই মতে বর্ধমান পোড়াও চৌহিরভিতে।
পুনরূপী আইলা বরগীকদর হুগলিতে।।[৩]

১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে ক্ষীরপাই তে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ দেখা দেয় সন্ন্যাসীদের উপস্থিতি বা সমাবেশ বিশেষভাবে হয়েছিল উত্তর মেদিনীপুরে, ক্ষীরপাই এবং তার পার্শবর্তী অঞ্চলে। ১৭৬৩ সাল থেকে ফরাসিরা ক্ষীরপাই তে কুঠি স্থাপন করে কাপড় ও সিল্কের ব্যবসা শুরু করে। ক্রমান্বয়ে ডাচ এবং ইংরেজ বণিকরাও এখানে বাণিজ্যের জন্য এসেছিলেন। প্রত্যেকেই কুঠি স্থাপন করে ব্যবসা বানিজ্য করতেন এবং বসবাসও করতেন। ফরাসিরা ক্ষীরপাই তে কুঠি স্থাপন করে কাপড় ও সিল্কের ব্যবসা শুরু করে স্থানীয় ফরাসিরডাঙ্গা স্থানটি ফরাসিদের সঙ্গে এখানকার সম্বন্ধ এখনও টিকিয়ে রেখেছে। ১৭৮৪ সালে ক্ষীরপাই কুঠির ইংরাজ রেসিডেন্ট তার রিপোর্টে বলেছেন - Since the peace of 1763 the French had a factory in the Town of Keerpay, where their Resident lives...... in 1771, they began to collect their outstanding balances,and in ....1773 they removed their effects.[8] ক্ষীরপায়ে বয়ন কারখানা বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। রেশম ও নীল চাষকে কেন্দ্র করে ইংরেজরা ক্ষীরপাই তে কুঠি স্থাপন করেছিলেন। ইংরেজদের কুঠি থেকে ডাচ বণিকরা এজেন্ট মারফত নিয়মিত দ্রব্যাদি কেনাকাটা করতেন। কাশিগঞ্জের নীলকুঠির স্তম্ভটি এখনো নীল চাষের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। ইংরেজরা ক্ষীরপাই এর ব্যবসায়ীদের দাদন দিয়ে কাপড় তৈরি করাতেন। এখানকার শিল্প ঐতিহ্য সম্পর্কে হান্টার সাহেব লিখেছেন -- At Chandrakona and Khirpai are larg settlements of cotton weavers and at Ghatal of silk weavers.[৫]

ক্ষীরপাই এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল রাধানগর সিল্কের রুমালের জন্য বিখ্যাত ছিল। এখানকার রুমাল মুঘল আমলে দিল্লিতে মুঘল হারেমে পাঠানো হতো এবং এখানকার লাটের হাট বিখ্যাত ছিল। ফরাসি ও ইংরেজদের বাণিজ্যিক স্বার্থের জন্য সেই সময়তে ক্ষীরপাই তে তাঁত শিল্পের প্রভূত শ্রী বৃদ্ধি ঘটলেও চাল ডালের ঢালাও ব্যবসা ছিল। চাউল কাঁটা নামক স্থানটি এইকারবারেরই স্মারক এছাড়া শিব বাজার, কাছারি বাজার, দয়াল বাজার,তিলি বাজার, নুনিয়া বাজার, হাটতলা প্রভৃতির নাম থেকে বোঝা যায় একসময় এখানে জমজমাট ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মীর কাশিমের সঙ্গে চুক্তি করে বাংলার তিনটি জেলা- মেদিনীপুর বর্ধমান ও চট্টগ্রাম উপঢৌকন স্বরূপ লাভ করেন। এই তিনটি জেলা থেকেই তখন সারা বাংলার মোট রাজস্বের তিন ভাগের এক ভাগ আদায় হতো। সেই সময় ক্ষীরপাই বর্ধমানের অধীনে ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে হুগলি জেলা গঠিত হবার পর ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে ক্ষীরপাই বর্ধমান জেলা থেকে হুগলি জেলার অধীনে আসে। ১৮৪৫ সালে ক্ষীরপাই হুগলি জেলার মহকুমা শহরে পরিণত হয়। In 1845theHooghly District was divided into three subdivisions the sadar (Chinsurah) Dwarhatta (Serampire) sand Khirpai.১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ক্ষীরপাই মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। এই জন্য এই অঞ্চলে একটি মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব আজও বিদ্যমান।১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে ক্ষীরপাই তে পৌরসভা স্থাপিত হয়।

১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কাছারি বাজারের শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের কন্যা দিনময়ী দেবীকে বিবাহ করেন। ক্ষীরপাই তখন রীতিমতো সমৃদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। বিদ্যাসাগর প্রথমে বীরসিংহ পরে ক্ষীরপাই অঞ্চলে মেয়েদের জন্য মডেল স্কুল স্থাপন করেছিলেন(১৮৫২-৫৩)। সেই সময় কাশিগঞ্জ শিক্ষা-দীক্ষায় প্রভূত উন্নতির সাধন করেছিল। ১৮৩৫ থেকে ১৮৩৮ এর Report on the State of Education in Bengal (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃক ১৯৪১ সালে প্রকাশিত) নামক গ্রন্থের ২২১ - ২২২ পৃষ্ঠায় আছে কাশিগঞ্জ থানায় মোট ৭৮ টি বাংলা বিদ্যালয় দুটি উড়িয়া বিদ্যালয় এবং পাঁচটি ফারসি বিদ্যালয় ছিল। উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলার চতুষ্পাথী সমূহের পরিচালন ব্যবস্থা ও সাধারণ পরীক্ষা গ্রহণ সংস্কৃত কলেজের মাধ্যমে হত। চন্দ্রকোনা থানার উল্লেখযোগ্য চতুঃষ্পাঠি গুলি ছিল ক্ষীরপাই,মাড়, বেলাদন্ড,আমড়াপাট, বোনা,মাংরুল,যদুপুর, জাড়া,মাধবপুর, রামজীবনপুর প্রভৃতি স্থান। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন বিদ্যাসাগর বাংলার বিদ্যালয় সমূহের বিভাগীয় পরিদর্শক রূপে মেদিনীপুর জেলায় ছটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গেও ক্ষীরপাই জড়িয়ে ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ বসু ক্ষীরপাই এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল গুলিতে সভা করেছিলেন। ১৯৩৮ সালে নেতাজি সুভাষচন্দ্র ঘাটাল মহকুমা ভ্রমণ কালে কালিকাপুর,ক্ষীরপাই ও ঘাটালে জনসভা করেছিলেন ৪২ এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় মেদিনীপুরের অন্যান্য মহকুমার তুলনায় এই অঞ্চল খুবই নিষ্ক্রিয় ছিল। ঘাটাল মহকুমার কংগ্রেস কর্মীদের অনেকেই গান্ধীজীর অহিংস নীতির ওপর আস্থা রাখতে পারেননি। ক্ষীরপাই-এর চৌধুরী বাড়ির অন্নদা প্রসাদ চৌধুরী কংগ্রেস সংগঠনের প্রথম সারির নেতা ছিলেন। অন্নদা প্রসাদ ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ছাত্র বন্ধু তিনি 1942 সালে পুলিশের চোখে ধুলো দিলেও 1945 সালে কাঁথিতে গ্রেপ্তার বরণ করেন এবং ১৯৪৬ সালে কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গে ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভায় অন্নদা প্রসাদ চৌধুরী অর্থমন্ত্রীর রূপে (১৯৪৭-৪৮) যোগদান করেন। এই সময় তিনি ক্ষীরপাই তে মহকুমা লাইব্রেরি এবং অভয় আশ্রম স্থাপন করেন। বাংলায় পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা আইন কে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে অন্নদা প্রসাদ চৌধুরী কংগ্রেস ত্যাগ করে "প্রজা সোশালিস্ট পার্টি"গঠন করেন(১৯৪৯) ১৯৪৮ সাল থেকে ক্ষীরপাই তে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে।

ক্ষীরপাইয়ের বাবরসা

ক্ষীরপাই এই বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির অবলুপ্তির প্রধান কারণ ছিল বর্ধমান ফিভার। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের অগাস্ট থেকে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে ম্যালেরিয়া জ্বর ক্ষীরপাইতে ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছিল। এর ফলে ক্ষীর পায়ের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা ক্রমশ জনহীন হয়ে গিয়েছিল। ক্ষীরপাই শহর শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। বর্ধমান ফিভারের পর লোকসংখ্যা যেমন কমে যায় তেমনি কর্মের অভিমুখও ঘুরে যায়। অন্নদা প্রসাদ চৌধুরী যখন অর্থমন্ত্রী ছিলেন তখনও তাঁতে কাপড় এবং গামছা বোনা হতো। এখন বেশিরভাগ জনসাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের থেকেও অর্থ করী কৃষি কাজে যুক্ত। বিশেষ করে আলু এবং ধান। এই অঞ্চলে চারটি কোল্ডস্টোরেজ আছে। চতুষ্পাঠী পাঠশালা কবেই উঠে গেছে, এবং স্কুল গড়ে উঠেছে।১৯৭০ এর পর এই অঞ্চলের চালচিএ বদলাতে শুরু করে। বিশেষ করে বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবাংলায় ক্ষমতার আসার পর।এই সমস্ত কিছুর পরেও এখানকার মানুষ উৎসবের দিনগুলিতে (ধর্ম পূজা, মকর সংক্রান্তিকে কেন্দ্র করে চব্বিশ প্রহর, গাজনকে কেন্দ্র করে চড়ক পূজা) সবকিছু ভুলে একত্রিতহয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই জৌলস না থাকলেও থেকে গেছে পুরানো পথ, পুরানো নাম। থেকে গেছে নীলকুঠির স্তম্ভ, বিখ্যাত কাছারি বাজারের ভট্টাচার্য পরিবার, রয়ে গেছে বিখ্যাত মিষ্টি বাবরশা, রয়ে গেছে বিষ্ণুপুরী ঘরানার চর্চা।

সূত্র নির্দেশ :-

১. অনিরুদ্ধ দাস, মুর্শিদাবাদ- বাণিজ্যপথ ঐতিহাসিক পরিক্রমা, ইতিহাস অনুসন্ধান -১৭, পৃ. ১৬২।

২. W W Hunter - The Statistical Accounts of Bengal (Roads and means of communications-vol-lll, p 148

৩. প্রণব রায় ও পঞ্চানন কাব্য তীর্থ- ঘাটালের কথা, পৃ. ৩১.

৪. বিনয় ঘোষ- পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতি। দ্বিতীয় খন্ড পৃ. ১০৬।

৫. W. W. Hunter- The Statistical Accounts of Bengal (Roads and means of communications-vol-lll, p. 148.

২

রাখিগড়ীর হরপ্পীয় সমাধিক্ষেত্র: অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সংক্রান্ত প্রথা ও আচর

তীর্থ রায়

প্রাক্তন ছাত্র, ইতিহাস বিভাগ

প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে রাখিগড় স্থানটি কে অন্বেষণ করার প্রথম প্রচেষ্টা ১৯৬০ এর দশকের শেষ দিকে হয়। পরবর্তীকালে ১৯৯৮-২০০১ সালে প্রত্নতত্ত্ব ইনস্টিটিউট এবং ASI এর উদ্যোগে যৌথভাবে জায়গাটি-তে প্রথম খনন শুরু হয়।পরবর্তীকালেডেকান কলেজ অফ পুনের তত্ত্বাবধানে ২০১৩ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত খননকার্য পরিচালিত হয়। রাখি খাস এবং রাখি শাহপুর এই দুটি গ্রাম মিলিয়ে প্রায় ৩৫০ হেক্টর এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকাসাতটি ঢিবি (RGR 1-RGR 7) রাখিগড় প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের অংশ। নতুন করে ২৪ ফেব্রুয়ারী RGR 1, RGR 3 এবং RGR ৭ স্থানে খননকার্য শুরু করে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ। মার্চ মাস নাগাদ RGR ৭ ঢিবি থেকে দুটি মানব কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়। তাদের উভয়কে উত্তর দিকে মাথা করে কুঁড়ে অবস্থায় প্রচুর মৃৎপাত্র, মূল্যবান মণি, পাথরের তৈরি পুঁতি, সামুদ্রিক ঝিনুকের খোলস দিয়ে তৈরি চুড়ি এবং ক্ষুদ্রাকৃতির তামার আয়নার মতো অলংকার দিয়ে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। যেটি হরপ্পা সভ্যতায় শেষকৃত্যের বৈশিষ্ট্য ছিল। তাদের পেলভিক গঠন এবং অন্যান্য জৈবিক বিবরণ পরীক্ষার মাধ্যমে লিঙ্গ নির্ধারণ করা হয়েছে দুইজন-ই মহিলা ছিলেন, মৃত্যুকালে তাদের বয়স হয়েছিল ৪০-৫০ বছরের মধ্যে।

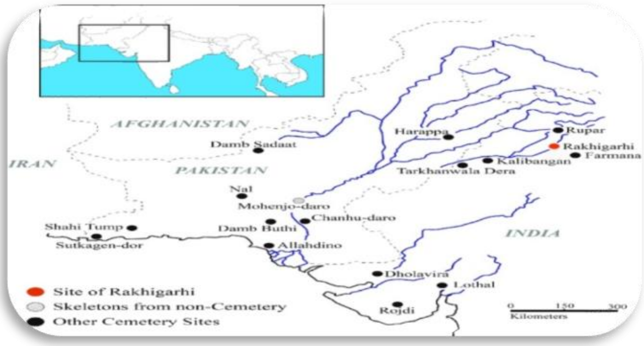
AFGHANISTAN
IRAN
PAKISTAN
INDIA
Damb Sadaat
Nal
Mohenjo-daro
Chanhu-daro
Damb Buthi
Shahi Tump
Sutkagen-dor
Allahdino
Harappa
Rupar
Rakhigarhi
Farmana
Kalibangan
Tarkhanwala Dera
Dholavira
Lothal
Rojdi
● Site of Rakhigarhi
○ Skeletons from non-Cemetery
● Other Cemetery Sites
0 150 300
Kilometers

রাখিগড়ীর মানচিত্র

বিশেষজ্ঞরা কঙ্কাল গুলির দাঁতের অংশ ও খুলির গোড়ায় অবস্থিত টেম্পোরাল হাড়ের পেট্রাস থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছেন এবং প্রাথমিক তদন্তের জন্য লখনউয়ের বীরবল সাহনি ইনস্টিটিউট অফ প্যালিওসায়েন্স-এ পাঠিয়েছেন। যার ডিএনএ বিশ্লেষণের ফলাফল হাজার হাজার বছর ধরে রাখিগড় অঞ্চলে বসবাসকারী লোকেদের পূর্বপুরুষ, খাদ্যাভ্যাস এবং তারা এই প্রাচীন শহরের আদিবাসী নাকি বসতি স্থাপনের জন্য অন্যত্র কোথাও থেকে স্থানান্তরিত হয়েছিল সেই সম্পর্কে বিষদে জানা যাবে। খননকার্যের ফলে এই শহরের নগর পরিকল্পনার একটি সুষ্ঠু রূপরেখা ফুটে উঠেছে নিষ্কাশন ব্যবস্থা সহ ঘর, অবশিষ্ট ধ্বংসাবশেষ অনুসারে ২.৬ মিটার সাধারণ প্রস্থের রাস্তা, নাগরিক সুবিধার জন্য গর্ত করে জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা, ইত্যাদি। প্রত্নতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞদের মতে হরপ্পা সভ্যতার সাংস্কৃতিক সময়কাল কে তিনটি যুগে বিভক্ত করা যেতে পারে - প্রারম্ভিক (৩৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ২৬০০ খ্রিস্টপূর্ব), পরিণত (২৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১৯০০ খ্রিস্টপূর্ব), এবং শেষ (১৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১৭০০ খ্রিস্টপূর্ব)। রাখিগড় প্রত্নক্ষেত্রটিতে ইতিহাসের স্তর হিসাবে, প্রারম্ভিক থেকে পরিনত হরপ্পা সময়কাল পর্যন্ত দেখা যায়, কার্বন ডেটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বয়স নির্ধারণ করতে গেলে, খননকার্যের বর্তমান অবস্থা অনুসারে RGR 7-খনন স্থানটি অস্থায়ীভাবে 3,000 খ্রিস্টপূর্বের কাছাকাছি বলা যেতে পারে।

রাখিগড়ীতে কঙ্কাল অধ্যয়ন

এই সভ্যতার প্রধান পাঁচটি শহর ছিল— মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, গানেরিওয়ালা, বর্তমানে প্রথম তিনটি পাকিস্তানে, শুধুমাত্র রাখিগড় এবং ধোলাভিরা ভারতে — হরপ্পা সভ্যতার এই পাঁচটি শহর কে প্রধান আঞ্চলিক কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করেছেন পণ্ডিত- রা। বর্তমান খননে RGR ১- প্রত্নক্ষেত্রটি থেকে প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য প্রত্নবস্তু ও পুরাকীর্তি গুলির মধ্যে রয়েছে স্টেটাইটের তৈরি সিল, হরপ্পার লিপি,আধা-মূল্যবান অ্যাগেট এবং কার্নেলিয়ান পাথর, পোড়ামাটির তৈরি কুকুর এবং স্টেটাইটের তৈরি ষাঁড়ের মূর্তি, তামার বস্তু, পুঁতি এবং শাঁখের খোল দিয়ে তৈরি অলংকার। ASI এবং হরিয়ানা সরকারের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী, RGR ১টিবির কাছে সরকার একটি ভবন নির্মাণ করে রাখিগড় পুরাকীর্তিগুলি প্রদর্শন করবে।

৩

ভয়নিক পাণ্ডুলিপি:শতবর্ষ-প্রাচীন ধাঁধার প্রথম অনুমোদিত অনুলিপি

সুজলদাস,

ষষ্ঠ সেমিস্টার, ইতিহাস বিভাগ

পঞ্চদশ শতাব্দীর এই কোডেক্সটি, যা সাধারণত “ভইনিচ পাণ্ডুলিপি” নামে পরিচিত, তাকে অনেকেই বিশ্বের সবচেয়ে রহস্যময় বই বলে থাকেন। এক অজানা লিপিতে এক অজানা লেখকের লেখা এই পাণ্ডুলিপিটির উদ্দেশ্য আজও ততটাই অস্পষ্ট, যতটা ছিল ১৯১২ সালে দুর্লভ বই ব্যবসায়ী উইলফ্রিড ভয়নিচের দ্বারা এটি পুনরায় আবিষ্কৃত হওয়ার সময়। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে এই পাণ্ডুলিপিটি আবির্ভূত হয়েছে এবং অদৃশ্য হয়েছে; পবিত্র রোমান সম্রাট দ্বিতীয় রুডলফের গ্রন্থাগার থেকে শুরু করে ১৯০৩ সালে রোমে সোসাইটি অফ জেসাসের একটি গোপন বই বিক্রি পর্যন্ত। বইটির ভাষা আজও পাঠোদ্ধার করা যায়নি, এবং এর বিস্তৃত অলঙ্করণগুলো যেমন সুন্দর, তেমনই বিভ্রান্তিকর।

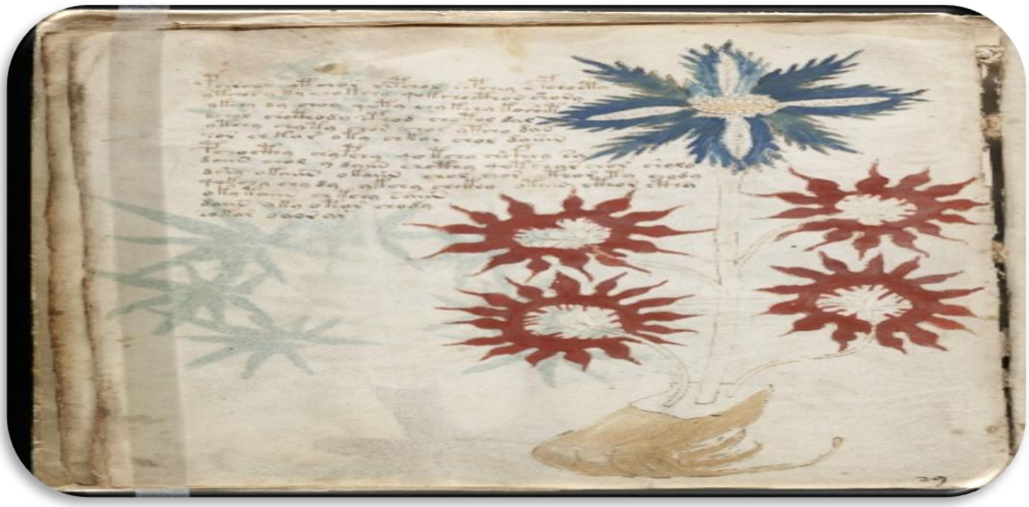

২৯ নম্বর পৃষ্ঠায় একটি পুষ্প-অলঙ্করণ

পাণ্ডুলিপিটির সাথে থাকা প্রবন্ধগুলো এই কাজটি সম্পর্কে আমরা কী শিখেছি—রসায়ন, সংকেত-লিখন, ফরেনসিক এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে—তা ব্যাখ্যা করে, কিন্তু সেগুলো খুব কমই চূড়ান্ত উত্তর দেয়। এর পরিবর্তে, নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর সর্বাধিক বিক্রিত বইয়ের লেখিকা ডেবোরাহার্কনেস তাঁর ভূমিকায় যেমনটা বলেছেন, বইটি “পাঠককে রহস্যের গভীরে আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়।”

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বা ষোড়শ শতাব্দীতে মধ্য ইউরোপে রচিত ভয়নিক পাণ্ডুলিপির উৎস, ভাষা এবং রচনাকাল নিয়ে এর ধাঁধাময় চিত্র এবং পাঠোদ্ধার না হওয়া পাঠ্যের মতোই আজও জোরালো বিতর্ক চলছে। এই পাণ্ডুলিপিটির নামকরণ করা হয়েছে পোলিশ-আমেরিকান পুরাকীর্তি-বই বিক্রেতা উইলফ্রিড এম. ভয়নিকের নামে, যিনি ১৯১২ সালে এটি সংগ্রহ করেন। একটি জাদুকরী বা বৈজ্ঞানিক পাঠ্য হিসাবে বর্ণিত, এর প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় রয়েছে উদ্ভিদবিদ্যা, চিত্রকলা এবং বৈজ্ঞানিক চিত্র, যা প্রাদেশিক কিন্তু প্রাণবন্ত প্রকৃতির এবং সবুজ, বাদামী, হলুদ, নীল ও লালের বিভিন্ন শেডের উজ্জ্বল প্রলেপসহ কালিতে আঁকা।

অঙ্কনগুলির বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে, পাণ্ডুলিপিটির বিষয়বস্তু ছয়টি বিভাগে বিভক্ত: ১) উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, যেখানে ১১৩টি অজ্ঞাত উদ্ভিদ প্রজাতির অঙ্কন রয়েছে; ২) জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্রীয় অঙ্কন, যার মধ্যে রয়েছে বিকিরণকারী বৃত্তসহ নক্ষত্র-মানচিত্র, সূর্য ও চাঁদ, রাশিচক্রের প্রতীক যেমন মীন (মাছ), বৃষ (বৃষ) এবং ধনু (ধনু), নল বা চিমনি থেকে বেরিয়ে আসা নগ্ন নারীমূর্তি এবং রাজকীয় ব্যক্তিত্ব; ৩) একটি জীববিদ্যা বিভাগ, যেখানে ক্ষুদ্রাকৃতির নগ্ন নারীমূর্তির অসংখ্য অঙ্কন রয়েছে, যাদের বেশিরভাগেরই উদর স্ফীত, যারা তরলে নিমজ্জিত বা বিচরণরত এবং অদ্ভুতভাবে আন্তঃসংযুক্ত নল ও ক্যাপসুলের সাথে মিথস্ক্রিয়া করছে; ৪) নয়টি মহাজাগতিক পদকের একটি বিস্তৃত বিন্যাস, যার অনেকগুলিই একাধিক ভাঁজ করা পাতাজুড়ে আঁকা এবং সম্ভাব্য ভৌগোলিক রূপ চিত্রিত করে। ৫) লাল, নীল বা সবুজ রঙের কলস বা পাত্রসহ চিত্রিত ১০০টিরও বেশি বিভিন্ন প্রজাতির ঔষধি লতা ও শিকড়ের ভেষজ-সংক্রান্ত চিত্র, এবং ৬) সম্ভবত রন্ধনপ্রণালী সম্বলিত ধারাবাহিক পৃষ্ঠা, যার প্রতিটি লেখার পাশে তারার মতো ফুল দিয়ে চিহ্নিত করা আছে।

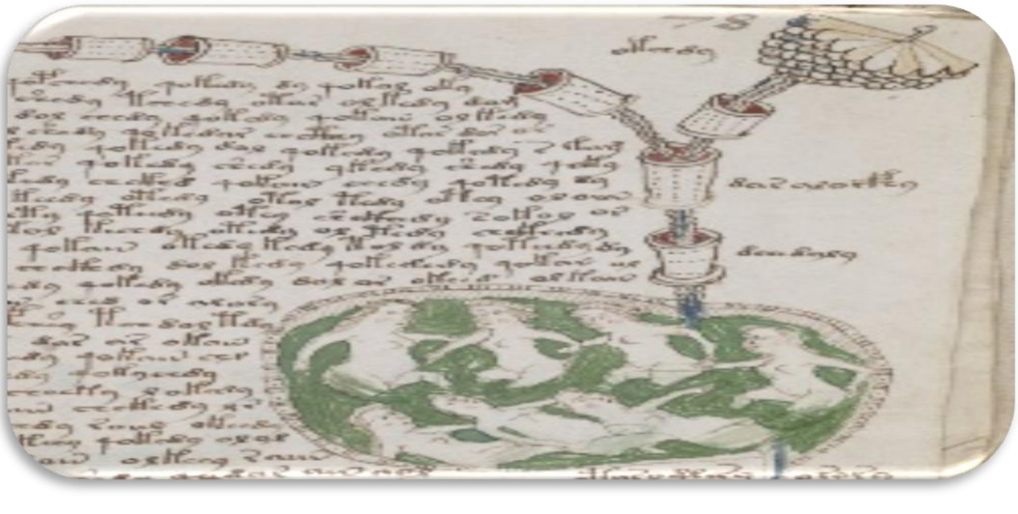

পাণ্ডুলিপির স্নান-চিকিৎসা বিষয়ক অংশের একটি বিশদ দৃশ্য

সংগ্রহের ইতিহাস

এর বিষয়বস্তুর মতোই, ভয়নিক পাণ্ডুলিপির মালিকানার ইতিহাসও বিতর্কিত এবং এতে কিছু ফাঁক রয়েছে। এই কোডেক্সটি জার্মানির সম্রাট দ্বিতীয় রুডলফের (পবিত্র রোমান সম্রাট, ১৫৭৬-১৬১২) মালিকানাধীন ছিল, যিনি এটি ৬০০ স্বর্ণ ডুকাটের বিনিময়ে কিনেছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন যে এটি রজার বেকনের কাজ। খুব সম্ভবত সম্রাট রুডলফ ইংরেজ জ্যোতিষী জন ডি-র (১৫২৭-১৬০৮) কাছ থেকে পাণ্ডুলিপিটি সংগ্রহ করেছিলেন। দৃশ্যত, ডি-র কাছে রজারবেকনের আরও বেশ কিছু পাণ্ডুলিপির সাথে এই পাণ্ডুলিপিটিও ছিল। ১৬৬৬ সালে ক্রোনল্যান্ডের ইয়োহানেস মার্কাস মার্সি বইটি আথানাসিয়াস কির্চারকে (১৬০১-১৬৮০) উপহার দেন। ১৯১২ সালে উইলফ্রিড এম. ভয়নিক রোমের নিকটবর্তী ফ্রাস্কাটিরজেসুইট কলেজ থেকে পাণ্ডুলিপিটি কিনে নেন। ১৯৬৯ সালে এইচপি ক্রাউসকোডেক্সটি বাইনেকে লাইব্রেরিকে দান করেন; তিনি এটি উইলফ্রিড ভয়নিকের বিধবা স্ত্রী এথেল ভয়নিকের সম্পত্তি থেকে কিনেছিলেন।

উপসংহার:-

ভয়নিচ পাণ্ডুলিপি ইতিহাসের অন্যতম বড় অমীমাংসিত রহস্য। শত বছরেরও বেশি সময় ধরে বিশ্বের সেরা গবেষকরা এটি পড়ার চেষ্টা করছেন, কিন্তু এখনও এর প্রকৃত অর্থ নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। তাই এটি ইতিহাস, ভাষাবিজ্ঞান ও ক্রিপ্টোগ্রাফির জগতে এক অনন্য রহস্য হিসেবেই রয়ে গেছে।

তথ্যসূত্র:

১. গোল্ডস্টোন, লরেন্স ও ন্যান্সিগোল্ডস্টোন, দি ফ্রায়ারঅ্যান্ড দি সাইফার: রজার বেকনঅ্যান্ড দি আনসলভড মিস্ট্রি অফ দি মোস্ট আনইউজুয়াল ম্যানুস্ক্রিপ্ট ইন দি ওয়ার্ল্ড, নিউ ইয়র্ক, ২০০৫।

২. রোমেইন নিউবোল্ড, উইলিয়াম, দি সাইফার অফ রজারবেকন । ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভানিয়া প্রেস, ফিলাডেলফিয়া, পেনসিলভানিয়া, ১৯২৮

৩. ম্যানলি, জন ম্যাথিউস। “বিশ্বের সবচেয়ে রহস্যময় পাণ্ডুলিপি: এটি কি রজার বেকন লিখেছিলেন এবং এর চাবি কি পাওয়া গেছে?”, হার্পার'স মান্থলি ম্যাগাজিন ১৪৩, ১৯২১, পৃ. ১৮৬–১৯৭।

8

History: Understanding the Past, Shaping the Future

Larka Biswas

Sem 4, Department of History

History is more than a record of dates and events—it is the story of humanity's journey through time. It helps us understand how civilizations developed, how cultures evolved, and how the decisions of the past continue to influence the world we live in today. From ancient civilizations to modern nations, history teaches us about the achievements, struggles, and sacrifices of people who shaped society. It reminds us of the importance of freedom, justice, equality, and unity. By studying historical events, we gain valuable lessons that help us avoid past mistakes and build a better future.

Past
Present
Future

India has a rich and diverse history, stretching from the ancient civilizations of the Indus Valley to the freedom movement led by great leaders who dreamed of an independent nation.

The courage and determination of countless individuals continue to inspire every generation to serve the country with honesty and dedication. For students, history is not only an academic subject but also a source of inspiration. It develops critical thinking, encourages curiosity, and helps us understand the connections between past and present. Every monument, document, and historical site tells a story waiting to be explored.

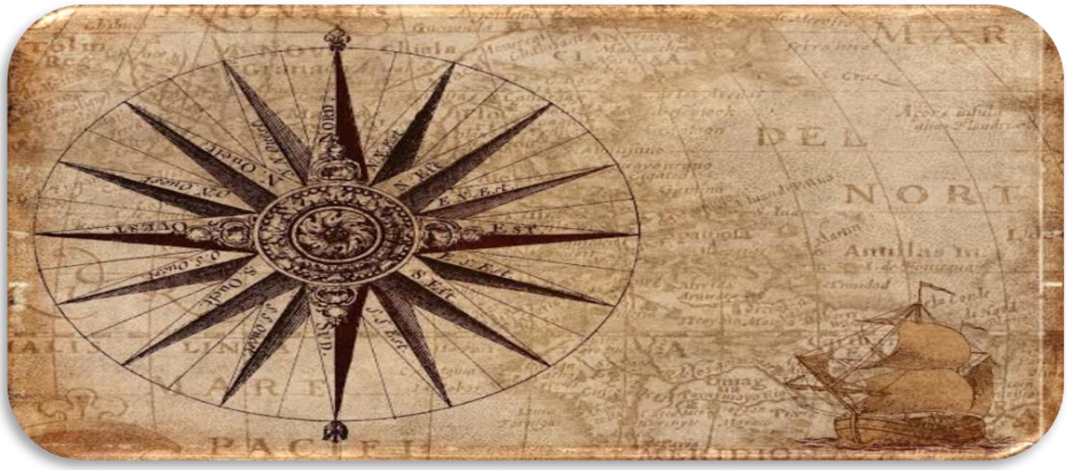

As we move toward a rapidly changing future, preserving our historical heritage becomes our shared responsibility. By respecting our traditions, protecting historical monuments, and learning from the experiences of those who came before us, we ensure that history remains a guiding light for generations to come. History is not just about remembering the past—it is about understanding our identity, appreciating our heritage, and creating a brighter future with the wisdom gained from those who came before us.

\

"History is the historian's experience; it is made by nobody save the historian; to write history is the only way of making it."

Michael Oakeshott

Mystery behind Egypt's Pyramids

Md. Zaid

Sem 6, Department of History

The Great Pyramid of Giza is one of the most remarkable engineering achievements in human history. It was built around 2580–2560 BCE during the reign of the Egyptian Pharaoh Khufu. Archaeologists agree that the pyramid was built by skilled Egyptian workers, not by aliens or any lost civilization. However, the exact methods used in its construction are still not fully understood. The Great Pyramid is made of about 2.3 million stone blocks, each weighing between 2 and 15 tons, while some granite blocks weigh over 50 tons. These stones were cut from quarries, transported over long distances, and placed with extraordinary precision. Even today, historians continue to debate how this was accomplished using the simple tools available at the time.

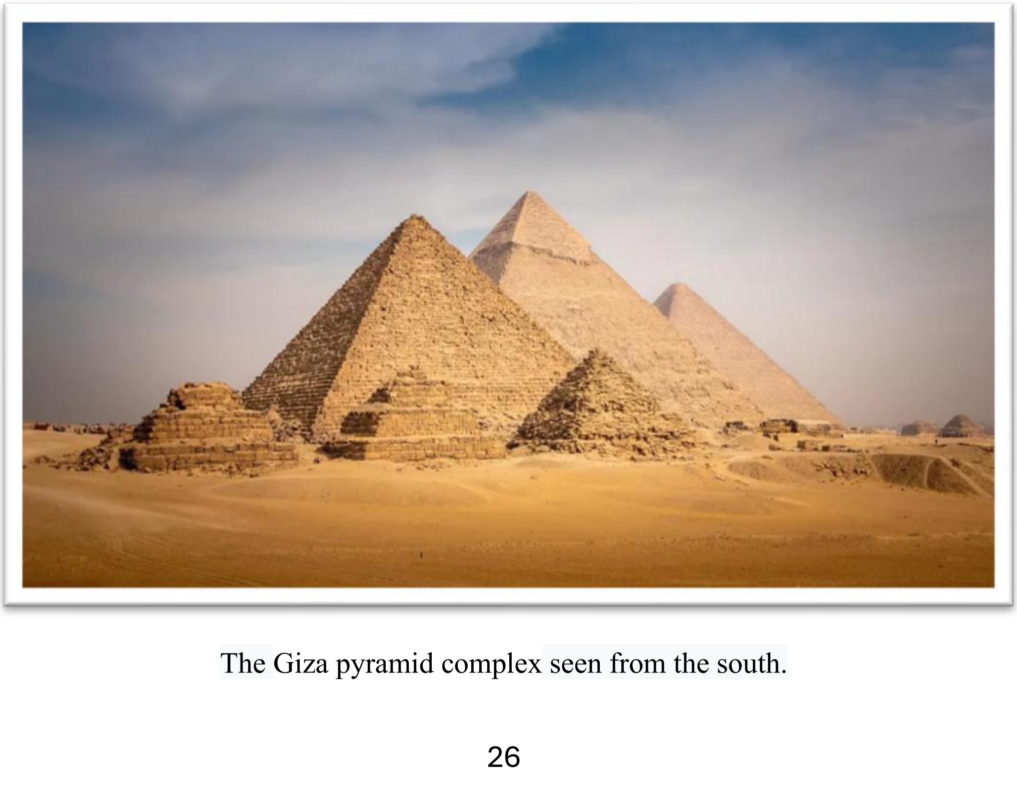

The Giza pyramid complex seen from the south.

Several theories have been proposed. The straight ramp theory suggests that workers pulled the stone blocks up a large earthen ramp. Another idea, the spiral ramp theory, argues that a ramp wound around the outside of the pyramid as it was built. A third theory proposes that an internal ramp was constructed inside the pyramid itself. Some researchers also believe that wooden levers were used to lift and position the heavy stones. Archaeological discoveries have shown that thousands of organized workers, including skilled craftsmen and labourers, lived in nearby workers' villages. Evidence also suggests that stones were transported on sledges over wet sand, reducing friction and making the heavy loads easier to move. Although many aspects of pyramid construction are now better understood, no ancient document explains the complete building process. For this reason, the exact techniques used remain one of history's greatest mysteries.

In conclusion, the pyramids demonstrate the advanced engineering, planning, and organizational skills of ancient Egypt. While historians know who built them and approximately when they were built, the precise methods used to achieve such extraordinary accuracy continue to be studied and debated.

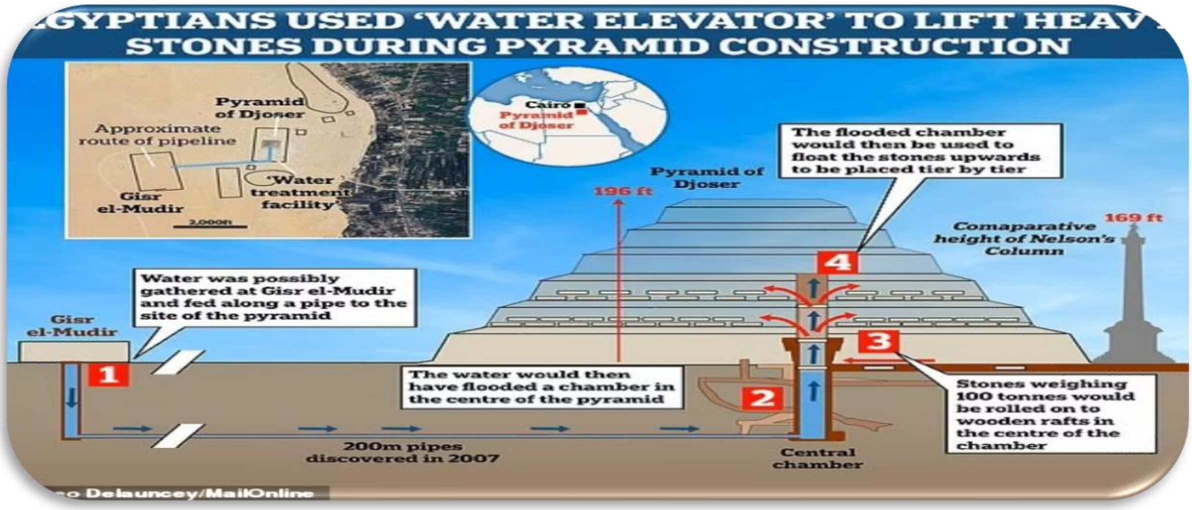
GYPTIANS USED 'WATER ELEVATOR' TO LIFT HEAV
STONES DURING PYRAMID CONSTRUCTION
Pyramid of Djoser
Approximate route of pipeline
Gisr el-Mudir
'Water treatment facility'
2,000ft
Cairo
Pyramid of Djoser
Pyramid of Djoser
196 ft
The flooded chamber would then be used to float the stones upwards to be placed tier by tier
Comaparative height of Nelson's Column
169 ft
4
Water was possibly gathered at Gisr el-Mudir and fed along a pipe to the site of the pyramid
Gisr el-Mudir
1
3
The water would then have flooded a chamber in the centre of the pyramid
2
Stones weighing 100 tonnes would be rolled on to wooden rafts in the centre of the chamber
200m pipes discovered in 2007
Central chamber
o Delauncey/MailOnline

৬

শিক্ষায় প্রান্তজন: উপেক্ষা, প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণ

মিলন রায়
সহকারী অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ, আনন্দ মোহন কলেজ, কলকাতা
Email ID-milanroy33@gmail.com

“পরিবর্তনের সবথেকে শক্তিশালী হাতিয়ার হল শিক্ষা”। নেলসন ম্যন্ডেলা

সামাজিক গতিশীলতার অন্যতম একটি মাধ্যম শিক্ষা। শিক্ষাযজ্ঞের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয় তার নিচেই ছিল এক সুগভীর তমসাছন্ন অঞ্চল, যেখানে বিরাজ করত বাংলার একাধিক অন্ত্যজ্য সম্প্রদায়।[১] এদেরকে শিক্ষার আলোতে পৌঁছোতে অনেক কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছে, যে ধারা এখনো প্রবাহমান। বাংলার হিন্দুধর্মের চতুর্বর্ণের বাইরে অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ ও অনার্য গোষ্ঠীভুক্ত মানুষেরা উপেক্ষার এই প্রবাহ থেকে মুক্তি পায় নি।[২] নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে স্থান পাওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই সমাজের মূল স্রোতে ফিরতে গিয়ে বারংবার লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে হয়েছে। [৩] তপশিলিজাতিদের বিকাশের উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার পর এত বছরে নানা কল্যাণমূলক কর্মসূচী[৪] গ্রহণ করা সত্ত্বেও, একাধিক কারণে তাদের সার্বিক শিক্ষার বিকাশ অধরাই থেকে গেছে।[৫] বিভিন্নশিক্ষা প্রতিবেদন ও গেজেটিয়ারগুলিতে প্রান্তিক অঞ্চল গুলিতে তেমন কোন পাঠশালার উল্লেখ পাওয়া যায় না। আর উচ্চবর্ণের প্রাধান্যযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সীমাহীন দারিদ্রের পঙ্কে নিমজ্জিত ও হীন মর্যাদার কারণে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিলনা বললেই চলে।

শিক্ষা সর্বজনীন রূপ গ্রহণকরে সাধারণ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করতে পারেনি, বরং এটি শ্রেণীবিন্যাসকে আরও জটিল করে তুলেছিল।[৬] উচ্চশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার একচেটিয়া অধিকার থাকায় সমাজের বৃহৎ অংশের নিম্নবর্ণের মানুষ তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল।[৭] তবে নিজ প্রতিভাবলে বলীয়ান কিছু বীরের নিদর্শন পাওয়া যায়, যারা নিম্নবংশে জন্মগ্রহণ করায় প্রতিটি পদে অবহেলিত, লাঞ্ছিত হয়েও অবশেষে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।[৮] 'আপস্তম্ভ ধর্মসূত্র' এর একটি অংশে শূদ্রদের বেদ শিক্ষার অনুকূলে মত দেওয়া হয়েছে।[৯] বিভিন্ন জাতক কাহিনীতে দেখতে পাওয়া যায় বস্ত্রকার, ধীবর প্রভৃতি শূদ্ররা শিক্ষা অর্জন করতে পারত,[১০] তেমনি আমরা কলহনের রাজত রঙ্গিণীতে শূদ্রদের শিক্ষালাভের কথাও জানতে পারি।[১১] শিক্ষা ব্যতীত কোনো উন্নয়ন সম্ভব নয়,[১২] তবে নিম্নবর্ণের মানুষের শিক্ষার প্রতি শাসকদের কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না।[১৩] ইংরেজরা কিন্তু সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এদেশে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করেনি।[১৪] কেননা এখানে জনগণকে শিক্ষিত করলে তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেত যা তাদের স্বার্থের অন্তরায় ছিল। মূলত তাদের শাসন ও শোষণের ধারা বজায় রাখার লক্ষেই তারা এই কাজে প্রয়াসী হয়েছিলেন।[১৫] তেমনি ইউরোপীয় খ্রিষ্টান মিশনারীরা তাদের সুচতুর বুদ্ধি প্রয়োগ করেএ দেশীয় মানুষদেরকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত ও তাদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে এক প্রাতিষ্ঠানিক ছত্রছায়ায় আনার চেষ্টা করেছিলেন। তাই ইংরেজী শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাপক আকারে চালু হওয়ার সঙ্গে সংস্কৃত সহ অনান্য দেশীয় ভাষায় শিক্ষালাভের গতিশীলতা হারাতে থাকে। নির্মল কুমার বসু এ প্রসঙ্গে লিখেছেন- "বাগদি বাউরি অথবা নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতি পূর্বেও যেমন অশিক্ষিত ছিল, আজও তেমনই রহিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে চাষ ও মজুরিতে অধিস্থিতদের সংখ্যা বেশ উচ্চ।"[১৬] শিক্ষার ছত্রছায়ায় আসতেনা পারার কারণ হিসাবে প্রথম ও প্রধান বাধা ছিল নিদারুণ দারিদ্রতা। পেটে ভাত নেই, পরণে ছেঁড়া পোষাক, যাদের অন্যের বাড়িতে না কাজ করলে দুবেলা খাবার জোটে না, তাদের কাছে স্কুলে যাওয়ার ভাবনা অলীক কল্পনা। এমনকি স্লেট পেন্সিল কেনার পয়সাও আমাদের তাদের থাকে না।'[১৭] পিতামাতা মজুরি বা অনান্য পেশায় খাটতে গেলে ছেলে-মেয়েগুলো উপর পরিবারের দায়িত্ব বর্তায়। তাদেরকে ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনা, রান্নাবান্না, গোবর কুড়োনো ও অনন্য ঘরের কাজ করতে হয়।[১৮]

চুনী কোটালের(লোধা শবর জনগোষ্ঠীর প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট) কথায় ‘সারাদিনের অনাহারের পর স্কুলে এসে মার খাওয়ায় অনেকে আর স্কুলে যেতেন না।...আবার একই ক্লাসে কয়েক বছর ফেল করে গরু চরাতে বাধ্য হয়।’[১৯] শবরকন্যা চুণী কোটালের মত হতদরিদ্র পরিবারের ছেলে মেয়েদেরও একই ভাবে হেরে যেতে হয় এই শিক্ষালাভের কঠিন সংগ্রামে।[২০] চুণী কোটালের ভাষায়- “আমাদের ভুল হলে পেতাম অকথ্য বেতের ঘা। বলতেন ভদ্র হবি বলে স্কুলে এসেছিস আর পড়া করতে পারিসনি।”[২১] বাঁকুড়ার সোনামুখী অঞ্চলে সাঁওতাল, বাগদি বাউরি পরিবার থেকে ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে আসায় এক শিক্ষক মহাশয় দুঃখ করে বলেছিলেন- “এখন মুড়ি-মিছরি সব এক হয়্যা গেছে। সাঁওতাল-বাউরি-খয়রাদের ঘর থিক্যা ছেল্যা আসছে। রেজাল্টটি ভালো হব্যে কেমন করে? উড়ের ঘরে কি শিক্ষা আছে? শিক্ষাটি পাবে কুথাকে?’ এমনকি ২০০৪-০৫ সালেও দেখতে পাই দলিত বা আদিবাসীদের রান্না করা খাবার না খাওয়া নিয়ে আন্দোলন।[২২]

পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি তপশীলি জাতির সাক্ষরতার হার (১৯৩১)

জাতির নাম	সাক্ষরতার হার	সাক্ষরতার হার (পুরুষ)	সাক্ষরতার হার (মহিলা)	লিঙ্গ বৈষম্য সূচক	ইংরাজীতে সাক্ষরতার হার	ইংরাজীতে -- সাক্ষরতার হার
বাগদি	১.৯২	৩.৩৮	০.৪৫	০.১৩	০.১২	৬.১৮
বাউরি	০.৭৭	১.১৬	০.৩৮	০.৩৪	০.০৪	৫.০২
চামার	৪.৫২	৬.২৯	১.৫৫	০.১৫	০.২৯	৬.৩২

ডোম	১.৯৮	৩.২৭	০.৬৫	০.১৯	০.১৫	৭.৫৯
হাড়ি	২.০৮	৩.৫৭	০.৫৩	০.১৪	০.১১	৫.৫১
নমঃশূদ্র	৬.৬৪	১১.৮৫	১.২২	০.১০	০.৯৭	১৪.৬৫
কামার	১৪.৯১	২৪.৯৮	৩.৭০	০.১৩	২.৫৭	১৭.২৩
মাহিস্য	১৫.৩০	২৬.৭৮	৩.২৪	০.১২	২.০৮	১৩.৫৭

উৎস: সেন্সাস অব ইন্ডিয়া, ১৯৩১, ভলিউম. ৫, বেঙ্গল অ্যান্ড সিকিম, পার্ট ২, টেবিল- ১৮৪।

বীরভূম, বাকুড়া জেলাতে ১৯০১ সাল পর্যন্ত বীরভূম, বাকুড়া সহ বিভিন্ন জেলাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনজাতিদের মধ্যে নারীশিক্ষার তেমন সন্ধান পাওয়া যায় না।[২৩] স্বাধীনতার পর মেয়েদের শিক্ষালাভের মাধ্যমে তাদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। তবে তাদের মধ্যে লিঙ্গ প্রভেদ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।[২৫] গ্রামীন এলাকায় ১৯৬১ সালে সাক্ষরতার ক্ষেত্রে লিঙ্গ প্রভেদ ছিল ১২.৬। ১৯৯১ সালে এই হার বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪০.১৩। শহর এলাকায় ১৯৬১ সালে সাক্ষরতায় লিঙ্গ প্রভেদ ছিল ৩৬.১৪ এবং ১৯৯১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৫৫.৬৭। অর্থাৎ এই প্রভেদের পরিমাণ গ্রাম ও শহর উভয় এলাকাতেই ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে পশ্চিমবঙ্গের বেশকিছু অঞ্চলের হিন্দু সমাজে নিম্নশ্রেণীর মেয়েরাই শিক্ষাক্ষেত্রে তুলনা মূলক অগ্রগামী ছিলেন।[২৬] ২০০১ সালের জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত তপশিলী সম্প্রদায়ের শিক্ষার হার ৫৯.০%। অন্যান্য তপশিলীসম্প্রদায় গুলির শুঁরি-৮২.৫%, ধোপা-৭৩.৯%, পোদ-৭২.৯%, নমঃশূদ্র-৭১.৯%।

তপশীলি জাতির সাক্ষরতার শতকারা হার – ১৯৭১

জাতি	সাক্ষর	সাক্ষর (পুরুষ)	সাক্ষর (মহিলা)	লিঙ্গ
বাগদি	১০.৭৯	১৭.২৬	৪.২০	০.২৪
বাউরি	১০.১১	১৫.৪৯	৪.৫৮	০.৩০

চামার	১২.০০	১৭.১৩	৫.৯৬	০.৩৫
ডোম	৯.৮৯	১৫.১৭	৪.১৯	০.২৮
হাড়ি	১১.৯৫	১৭.৯৬	৫.৫৬	০.১৩
নমঃশূদ্র	২৬.৮৬	৩৬.২৪	১৬.২২	০.৪৫
ধোবি	২৪.২৮	৩৩.৮৪	১৩.৬৯	০.৪০
রাজবংশী	১৭.৫৩	২৫.৯৬	৮.৬৬	০.৩৩

উৎস:সেন্সাস অব ইন্ডিয়া ১৯৭১, স্পেশাল টেবিল ফর সিডিউল কাস্ট অ্যান্ড সিডিউল ট্রাইবস, ওয়েস্ট বেঙ্গল, পার্ট ৫/এ,(ক্যালকাটা, ১৯৭১)

পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক তপশীলি সম্প্রদায়ের শ্রেণীর শিক্ষার উন্নতিবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে, যা সার্বিকভাবে তাদের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ বৃদ্ধি করেছে।[২৭] এরফলে একদিকে যেমন বাগদি সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে স্কুলছুটের পরিমাণ কমেছে তেমনি পঠন-পাঠনের পরিবেশের উন্নতি ঘটেছে। সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া বাগদি সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে বাধা অনেক। তবে সেই বাধা দূর করে বর্তমানে অনেকটা অগ্রগতি ঘটেছে, যার প্রভাব তপশীলি সম্প্রদায়ের সমাজের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস, শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি তাদের বহুদিনের অনুন্নত জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে পরিলক্ষিত হচ্ছে।[২৮] কেবলমাত্র সংখ্যাতাত্ত্বিক ভাবেই নয় বাগদিদের মানব সম্পদের প্রকৃত বিকাশ ঘটলেই বিভিন্ন কর্মধারা সাফল্য লাভ করবে। উনবিংশ শতাব্দীর আশির দশকেও ১৮৮৩-৮৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের কলেজে পড়া ছাত্রদের শতকরা ৮৪.৭ জন এবং স্কুলে পড়া ছাত্রদের শতকরা ৭৩.৪ ছিল ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, এবং কায়স্থ এই তিন উচ্চবর্ণের। আর নিম্নবর্ণের শূদ্রদের ক্ষেত্রে ঐ দুই শ্রেণীর ছাত্রদের অনুপাত ছিল যথাক্রমে শতকরা ৬ ও শতকরা ১৪.২। তেমনি ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকরির বেশীরভাগই উচ্চবর্ণের দখলে ছিল।[২৯] ২০০১ সালে নদীয়া জেলায় মোট তপশিলী জাতির জনসংখ্যা ছিল ১৩,৬৫,৯৮৫ জন (মোট জনসংখ্যার ২৯.৬৬ শতাংশ) যার মধ্যে ১১,২৮,১৯০ গ্রামবাসী, (৮২.৫৯%) এবং ২,৩৭,৭৯৫ শহরবাসী (১৭.৪১)। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী নদীয়া জেলার ২৯.৬৬% দলিত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। ২০০১সালেরজনগণনায় পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত তপশিলী সম্প্রদায়ের শিক্ষার হার ছিল ৫৫.৯%। সেখানে বাগদিদের মধ্যে এর পরিমাণ ৪৭.৭% (পুরুষ ৬০.৪ %ও মহিলা ৩৪.৮%) অন্যান্য তপশিলী

সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বাগদিদের অবস্থান অনেকটা পিছনে (সুরনী-৮২.৫%, ধোবা-৭৩.৯%, পোদ-৭২.৯%, নমঃশূদ্র-৭১.৯%)। তাদের মধ্যে মাধ্যমিকের উপর শিক্ষালাভের হার মাত্র ৪.৯%। বাগদি সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাক্ষরতার ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য খুব বেশী (২৫.৬%)।[৩০]

নারীরা করছে বিশ্বজয়
তবুও কি নারীরা
থাকবে অবহেলায়।

শনিবার বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষে দুবরাজপুরে আদিবাসী মহিলাদের পদযাত্রা। –নিজস্ব চিত্র

কিছু জেলাতে প্রান্তিক বিদ্যালয়ে নিম্নবর্ণের ছাত্র-ছাত্রীদের জোরপূর্বক শ্রেণীকক্ষে আলাদা করে বসানো হত।[৩১] তেমনি পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমার রোহিনী গ্রামে শিক্ষকরাই নিম্নবর্ণের ছাত্রছাত্রীদের বাড়ি থেকে মাদুর আনতে বলতেন।[৩২] কোন বিষয় বুঝতে না পারলে শিক্ষক তাদের কাছে গিয়ে বোঝান না।[৩৩] বাঁকুড়া জেলার রোহিনিতে ডোম, হাড়িদের পাড়ার বাইরে যেতে হলে তাদেরকে গলায় ঘন্টা পরতে হত যাতে উচ্চবর্ণের লোকেরা আগে থেকে সর্তক হয়ে যায়। তাদের সংস্পর্শে এলে ব্রাহ্মণ সহ অন্যান্য উচ্চবর্ণের শুদ্ধস্নান আবশ্যিক ছিল কেননা অস্পৃশ্য নিম্নবর্ণের লোকদের দর্শন করা তাদের পক্ষে অমঙ্গল স্বরূপ ছিল। তাদের কাছ থেকে উচ্চবর্ণের লোকেরা জল গ্রহণ করত না এমনকি নাপিতরাও তাদের চুলদাড়ি কাটতে অস্বীকার করত।[৩৪] ব্রাহ্মণদের বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে জুতো খুলে যেতে হত। এমনকি উচ্চবর্ণের পাড়ায় কূপ বা নলকূপ থেকে বাগদি সহ অন্যান্য প্রান্তিক জাতিদের জলসংগ্রহ করতে দেওয়া হয় না। শুধুমাত্র সরকার দ্বারা স্থাপন করা নলকূপগুলিই তারা ব্যবহার করতে পারে। যার ফলে রুক্ষমাটির অঞ্চল বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলাগুলিতে বাগদি সহ অন্যান্য নিম্নবর্ণের মহিলাদের অনেক দুর থেকে জল আনতে হয়। তাই তাঁরা অনেক সময় বাধ্য হয়ে নিকটবর্তী পুকুর বা ডোবার জল ব্যবহার করেন। অপরিশোধিত এই জল পান করার ফলে তাঁরা আর্সেনিকসহ নানা জলবাহিত রোগের শিকার হন।

বিপ্লব প্রতিবিপ্লব, রণক্ষেত্রে প্রতিবাদ, প্রভৃতি নানা সামাজিক আন্দোলনে মেয়েদের অংশগ্রহণ থাকলেও সমাজ তাদের মর্যাদার স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত। নিম্নবর্গের নারী বা প্রান্তিক নারীদের অবস্থা তো আরও করুণ। উচ্চবর্গ লিখিত ইতিহাসে তাদের যেন কোন স্থান নেই তেমনি নিজ সমাজেও তারা উপেক্ষিত, অবহেলিত ও শোষিত। নিজের কথা তারা বলার সুযোগই পান না। আর তাই মুখ বুজে সহ্য করে যান যাবতীয় লঞ্ছনা ও গঞ্জনা।[৩৫] গ্রামের প্রান্তভাগে বসবাসকারী এই অন্ত্যজ, উপেক্ষিত, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী জাতপাত প্রথার আঘাতে শোষিত হতে হতে ভোটব্যাঙ্কের সংখ্যায় রূপান্তরিত হন। রাষ্ট্রের নানা সুযোগ-সুবিধা তাদের জন্য রচিত হলেও তারা তার ছিঁটেফোটাও পান না। রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য এই বিপুল সংখ্যক উপেক্ষিত প্রান্তিক জনগণকে উচ্চবর্ণের রাজনৈতিক নেতারা হিমায়িত করে যাবতীয় সুযোগ আত্মসাৎ করেন। একাধিক প্রতিবাদী কণ্ঠের জাগরণ ঘটলেও তা প্রচারের আলোতে আসেনা বা অনেক কারণে সাফল্য লাভ করেনা। তাদের সরলতা কে কাজে লাগিয়ে লোভী, নিষ্ঠুর, শাসকরা তাদেরকে ভুলপথে চালিত করেছেন।[৩৬]

রাজনীতি, প্রশাসন, আরক্ষা বা বিচারব্যবস্থার উচ্চপদগুলোতে নারীরা আজও সংখ্যালঘু। ১৯৯৬ সালে ভারতীয় প্রশাসনিক কৃত্যক (আই.এ.এস)-এ মহিলা অফিসার ছিলেন মাত্র ৯.৯%, ভারত আরক্ষকৃত্যক (আই.পি.এস)-এ সংখ্যাটি আরও কম মাত্র ২.২% কিন্তু সম্প্রতি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। আই.সি.এস. পরীক্ষায় প্রথম ৪ জনই নারী যা নারীদের মধ্যে এক নতুন আশার সঞ্চার করেছে।[৩৭] ১৭৪ টি দেশের মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক ক্ষমতায়নে ভারতের স্থান ৯৩।[৩৮] তবে প্রান্তিক নারীসমাজ এখনো শিক্ষার মানচিত্রে কার্যত অদৃশ্য রয়েছে। আর উচ্চশিক্ষা তো তাদের কাছে অলীক কল্পনা। আজও ভারতবর্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযুক্ত বয়সের ১২ কোটি ৫০ লক্ষ শিশু বিদ্যালয়ে যায় না। এদের অধিকাংশই বালিকা। এদের শিক্ষার বিষয়টি প্রাধান্য পায় না প্রধানত দারিদ্রের কারণে। ভয়াবহ দারিদ্রই অশিক্ষার অন্ধকার থেকে আলোয় প্রবেশে তাদের বাধা দেয়, তাদেরকে ঠেলে দেয় শিশুশ্রমের ভয়ংকর দুনিয়ায়। একথা আরও বেশী প্রযোজ্য বাগদি মহিলাদের ক্ষেত্রে। বাগদি মহিলারা বিভিন্ন কাজে গেলে বাড়ির কিশোরী মেয়েদের উপর কাজের চাপ বাড়ে। ফলে কোপ পড়ে তাদের শিক্ষার উপর। তাদেরকে মূলত বাড়িতে ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনা, রান্নাবান্না, জ্বালানী সংগ্রহ, গৃহপালিত পশুর খাবার দেওয়া ইত্যাদি কাজ করতে হয়।[৩৯] অনেক সময় তাদেরকে মায়েদের সঙ্গে কাজে যোগদান করতে দেখা যায়।[৪০] যদিও তাদের মজুরী অনেকটা কম হয়।[৪১] সম্প্রতি বাগদি মেয়েদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।[৪২] তদের স্বোপার্জিত অর্থ তাদের ভাই-বোনদের পড়াশুনো ও

তাদের পরিবারের আর্থিক সমস্যা সমাধানে বিশেষভাবে সাহায্য করছে।[৪৩]আর এই সমস্ত কারণেই তারা বাড়ি থেকে দূরের বিদ্যালয়ে যেতে পারে না বা ভর্তি হলেও তাদের শিক্ষা বেশিদুর প্রসার লাভ করতে পারে না। কিন্তু বর্তমানে সরকারী ও বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পদক্ষেপের ফলে অন্যান্য শ্রেণীর মত বাগদি সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার অনেক পরিবর্তন এসেছে।[৪৪] বিভিন্ন অঞ্চলে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনের মাধ্যমে ও মহিলাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছে।[৪৫] শতকারা ৯৩.৬ ভাগ (২০০৬)[৪৬] গোষ্ঠীর নিজস্ব সঞ্চয় খাতা রয়েছে। মোট জমা রাশির অর্থ সদস্যরা নিজেদের প্রয়োজনে বিভিন্ন খাতে ব্যয় করে।[৪৭] মিড-ডে-মিল প্রবর্তিত হওয়ার ফলে বেশ কিছু অঞ্চলেছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয় যাওয়ার প্রবণতা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।[৪৮] একবেলা পেটভর্তি খাবার এখানকার অনেক ছাত্রছাত্রীদের আশীর্বাদ স্বরূপ।[৪৯] তাদের আর অন্যদের উপর নির্ভরশীল হতে হবে না।[৫০] পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির উচ্চ সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা লাভ করার ফলে উন্নত জীবনযাত্রা তাদেরকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।[৫১] ১৯৮৪ সালের এক সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতের গ্রামাঞ্চলে ৬০% বালিকাকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হলেও পাঁচবছর পর দেখা যায় মাত্র ১৬% বালিকা বিদ্যালয়ে যায়।[৫২]

তপশিলী সম্প্রদায়ের সাক্ষরতার হার, ২০০১

	তপশিলী সম্প্রদায়ের নাম	তপশিলী সম্প্রদায়ের হার	সাক্ষরতারহার	পুরুষ	মহিলা
১.	সমস্ততপশিলীসম্প্রদায়	১০০	৫৯.০	৭০.৫	৪৬.৯
২.	শুনরি (সাহাছাড়া)	১.৭	৮২.৫	৯২.৭	৭১.৪
৩.	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়	১২.০	৭২.১	৮৩.৫	৫৯.৯
৪.	নমঃশূদ্র	১৭.৪	৭১.৯	৮০.৬	৬২.৮
৫.	বাগদি	১৪.৯	৪৭.৭	৬০.৪	৩৪.৮
৬.	বাউরি	৫.৯	৩৭.৫	৫১.৮	২৭.৭

উৎস: অফিস অব রেজিস্টার জেনারেল, ইন্ডিয়া ২০০১।

জীবনসংগ্রামের মত লেখাপড়া চালাতে গিয়ে বাগদি মেয়েরা বিভিন্নভাবে বাধা পায়। আর এই সত্যতা প্রতিফলিত হতে দেখেছি চুনী কোটালের ব্যক্তি জীবনে।“একে লোধা, তায় মেয়ে! কোনদিন পড়া ধরতেন না চুনির। একদিন চুনি নিজে পড়া তৈরি করে এগিয়ে গেল গুরুমশায়ের কাছে। যেমনি একটু ভুল হয়েছে অমনি বেতের পর বেত। চুনির ছেঁড়া জামার মধ্যে বেতের ডগা ঢুকিয়ে জামাটা ফর্দাফাই করে দিলেন। সেদিন বাড়ি ফিরে চুনির সেকিকান্না! ঐ একটাই জামা ছিল যে চুনির।”[৫৩] মহাশ্বেতা দেবী চুনীকটালের মৃত্যুর প্রতিবাদ সমাবেশে বলেছিলেন- “প্রমিথিউসের মতো আগুন চুরি করতে গিয়েছিল তাই তাঁকে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করতে হল।”[৫৪] অপরাধ প্রবণ’ লোধাগোষ্ঠীর মেয়ে পড়াশুনো করে করে চাকরি করবে নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানের শিক্ষক ফাল্গুনী চক্রবর্তী কিছুতেই সহ্য করতে পারেননি। চুনীকে ফর্মফিলাপ করতে না দেওয়া, পরে ভর্তি হলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে ভাবে অপমানিত করা হত। চুনী লিখেছেন-“কোন লগ্নে কোন তিথিতে যে এই মাটির পৃথিবীতে এসেছিলাম জানি না। নিশ্চয় সেই মুহূর্ত ভালো ছিল না। আর কিসের প্রয়োজনে যে আমাদের মত ছেলেমেয়েরা তার উত্তর খুঁজে পাই না’। “মাস্টারমশায় কি করে বুঝবেন স্কুল থেকে ফিরে রাস্তায় জাম, কুল কুড়িয়ে খেয়ে যাদের দিন যায়, তাদের ব্যথা, কত অশ্রুই যে ঝড়ে পড়েছে তার আজ কোন সাক্ষী নেই।”[৫৫] আজও শিক্ষকদের কাছে এরা নির্বোধ, অযোগ্য এবং পড়াশোনার পক্ষে অনুপযোগী।

কিছু পরিবারের পুরুষরা মনে করেন মেয়েরা শিক্ষিত হলে তাদের পারিবারিক প্রাধান্য হ্রাস পাবে।[৫৬]যেই প্রবণতা আজও ফল্গুধারার মত প্রবাহমান। অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন এখনো অনেক মানুষের মর্মে পৈছাতে পারেনি। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে ২ নং ব্লকের নিল ডি গ্রাম পঞ্চায়েতের লাল ডাঙ্গা গ্রামে এখনো নিচু জাতের মেয়ে রান্না করায় কেউ সেই খাবার নিতে রাজী হয়না। এই ধারা পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলায় দেখা গ্যছে। শত চেষ্টা করলেও ঐ শতাব্দী প্রাচীন অস্পৃশ্যতার বেড়াজাল থেকে কিছুতেই মুক্ত করতে পারিনি। ঐ সব মানুষদের বোঝাতে গেলে তারা বলেন- “আমরা অতসব শুনতে চাই না। নিচু জাতের মেয়ে রান্না করলে কেউ খাবে না।”[৫৭] নারীপুরুষের বৈষম্য আগের তুলনায় অনেক কমতে থাকলেও নিম্নবর্ণের মহিলাদের অগ্রগতির হার উচ্চশ্রেণীর মহিলাদের তুলনায় অনেক কম।[৫৮]

12
1
MID DAY MEAL SCHEME

২০০১ সালে বাগদি সম্প্রদায়ের সাক্ষরতার হার ৪৭.৭% (পুরষ ৬০.৪% ও মহিলা ৩৪.৮%) সাক্ষরতায় লিঙ্গ প্রভেদও বেশী (২৫.৫%)। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও এই বৈষম্যে বজায় রয়েছে। ২০১৬ সালে প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৪-১৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের সংখ্যা ছিল ৪৯,২১৭। তার মধ্যে তফসিলি সম্প্রদায়ের অধ্যাপকের সংখ্যা ৩.০৩৭ (৬.১৬%) আর তফসিলি উপজাতিভুক্ত অধ্যাপকের সংখ্যা ৪৫১ (০.৯১%)।[৫৯] উচ্চশিক্ষায় তফসিলিজাতি ও তফসিলি উপজাতিভুক্ত ছাত্র ছাত্রীদের পিছিয়ে পড়ার কারণ হিসাবে সীমাহীন দারিদ্র, বেকারি, মাদকাসক্তি, দায়ী।[৬০] আসলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নারী ও পুরুষের উন্নতি হলেও প্রকৃতপক্ষে নারীরা অনেকটা পিছিয়ে আছে।[৬১] সাধারনত উচ্চবর্ণের তুলনায় নিম্নবর্ণের নারীদের দুর্দশার হার অনেকগুন বেশী। কয়েক বছর আগেও ভারতের মহিলাদের অর্ধেক অর্থাৎ ৫০% নিরক্ষর ছিল।[৬২] প্রতিটি উন্নত দেশের উন্নতির ভিত্তিভূমি হল সেখানকর নারীসমাজ।[৬৩] তাই যতই আমরা উন্নত ভারত গঠনের দাবী করিনা কেন নারীসমাজের উন্নতি ছাড়া কোনদিনই লক্ষ্য[৬৪] অর্জন করা সম্ভবপর নয়। ২০০১ সালে পশ্চিমবঙ্গে তপশিলী সম্প্রদায়ের সাক্ষরতার হার শতকারা ৫৯.৫। এর মধ্যে পুরুষ ও মহিলাদের অনুপাত যথাক্রমে শতকারা ৭০.৫ ও ৪৬.৯। বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য দূর করে তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

সূত্র নির্দেশ ও টীকা

১. এস শ্রীনিবাস রাও, প্রান্তিক তপশিলি জাতি-উপজাতির শিক্ষা ইস্যু চ্যলেঞ্জ ও অগ্রগতির উপায়, ধনধান্যে, জানুয়ারি, ২০১৬, পৃ. ৪৬।

২. এইচ .এইচ. রিজলে, দি ট্রাইবস অ্যান্ড কাস্টস অফ বেঙ্গল ,ভ্যলুম ১, ফার্মাকে. এল ,ক্যালকাটা, ১৮৮১,পৃ. ৩৭।

৩. মেসবাহ কামাল, বাংলাদেশের আদিবাসী এথনোগ্রাফিয় গবেষণা, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা, উৎস প্রকাশন, ২০১৫, পৃ. ২৪৬।

৪. সৌম্য শ্রীবাস্তব, তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য বরাদ্দ ও বিকাশ, যোজনা, জানুয়ারি, ২০১৪, পৃ. ২৪।

৫. তদেব, পৃ. ২৪।

৬. এফ.ই.এ.কি, হিস্ট্রি অফ এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান, এস. চাঁদ অ্যান্ড কোং, নিউ দিল্লি, ১৯৭০, পৃ. ১২।

৭. অতুল সুর, বাংলার সামাজিক ইতিহাস, জিজ্ঞাসা পাবলিকেশন প্রাঃলিঃ, কলকাতা, ১৯৮৯,পৃ. ৩২।

৮. রামশরণ শর্মা, প্রাচীন ভারতে শূদ্র, কে.পি .বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ১২৩-১২৪।

৯. তদেব, পৃ. ১২৩-১২৪।

১০. তদেব, পৃ. ১২৩-১২৪।

১১. এম. এ. স্টেইন, কলহনস রাজতরঙ্গিনী, মতিলাল বানারসী দাস, ভ্যলুম ১, বারানসী, ১৯৬১, পৃ. ১৯৬।

১২. মোহ. জাহাঙ্গীর হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬।

১৩. পরমেশ আচার্য, বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা, অনুস্টুপ, কলকাতা, ২০০৯,পৃ. ৮৪-৮৫।

১৪. বিকাশ রায়, শিক্ষা প্রসারের বীরভূম জেলা, পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম জেলা সংখ্যা, কলকাতা, তথ্য ও সংস্কৃতিবিভাগ, ফেব্রুয়ারি, ২০০৬ ,পৃ.৮২।

১৫ ,আকুলানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, নদীয়া জেলার শিক্ষা-গ্রন্থাগার-সাক্ষরতা, পশ্চিমবঙ্গ, নদীয়া জেলা সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা, ১৯৯৭,পৃ.৯৮।

১৬. বসু নির্মলকুমার, হিন্দু সমাজের গড়ন, বিশ্বভারতী গ্রথন বিভাগ, কলকাতা, ১৯৪৯, পৃ. ১৩৩।

১৭. সেন অমর্ত্য ও অন্যান্য, প্রতীচি শিক্ষা প্রতিবেদন, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১১৯।

১৮. তদেব, পৃ. ৬১।

১৯ কোটাল চুনী, আত্মকথা: আমার জীবন, বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দীপ (সম্পাদিত), দলিতের আখ্যানবৃত্ত, মৃত্তিকা, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১৩৪-১৩৭।

২০. গুপ্ত অনীশ, দি আউটকাস্ট, সানডে, ২-৮ নভেম্বর, ১৯৯৭, পৃ. ৪৮-৫০।

২১. কোটাল চুনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫।

২২. বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দীপ, দলিতের আখ্যানবৃত্ত, মৃত্তিকা, কলকাতা, ২০১০,পৃ. ১৮৪।

২৩. কর রামানুজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

২৪. দাস, অমল, ভারত ইতিহাসে নিম্নবর্গের নারী শ্রমিক, এদের সংকট ও সংগ্রাম, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১৭০-১৭২।

২৫. কর রামানুজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

২৬. মজুমদার আর. সি., গ্লিম্পসসেস অফ বেঙ্গল ইন দি নাইনটিনথ সেঞ্চুরী, ফার্মা কে.এল, ক্যালকাটা, ১৯৬০, পৃ. ৫৫।

২৭. রায় বিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।

২৮. তদেব, পৃ. ৮৫।

২৯. রিপোর্ট অব দি ডি. পি. আই., বেঙ্গল, ফর ১৮৮৩-৮৪, কোটেড ইন অনিল শীল, দি ইমারজেন্স অব ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম, কেমব্রিজ, ১৯৬৮, পৃ. ৬১-৬২।

৩০. ওয়েস্ট বেঙ্গল ডেটা হাইলাইটস: সিডিউলড কাস্ট, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩-৪।

৩১. ঘোষ শাশ্বতী, মেয়েদের কাজ: ক্ষমতার অন্য নাম? যোজনা ধনধান্যে, মার্চ, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৯।

৩২. দ্যা স্টেটসম্যান কলকাতা, ১১ নভেম্বর, ২০০১।

৩৩. গুপ্ত অনীশ, দ্যা আউটকাস্ট, সানডে, ২-৮ নভেম্বর, ১৯৯৭, পৃ. ৪৮-৫০।

৩৪. সেন শুচিব্রত, বীরভূমের অতীত ও বর্তমান সমাজচিত্র: সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা, পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম জেলা সংখ্যা, কলকাতা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, ফেব্রুয়ারী, ২০০৬, পৃ. ১১১।

৩৫. দাশগুপ্ত শতদল, কাস্ট কিংশিপ অ্যান্ড কমিউনিটি, ইউনিভার্সিটি প্রেস, হায়দ্রাবাদ, ১৯৯৩, পৃ. ২৭।

৩৬. দাস অমল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০-১৭২।

৩৭. ঘোষ শাশ্বতী, প্রাগুক্ত, ২০০১, পৃ. ৯।

৩৮. তদেব, পৃ. ৯।

৩৯. কোটাল চুনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪-১৩৭।

৪০.তদেব, পৃ. ১৩৪-১৩৭।

৪১. মাঝি বিপ্লব, ফেমিনিজম নারীবাদ ও তৃতীয় দুনিয়ার প্রান্তিক নারী, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৭৪।

৪২. ঘোষ শাশ্বতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

৪৩. মাঝি বিপ্লব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

৪৪. জয়ন্তী সি, শিক্ষার মাধ্যামে মেয়েদের ক্ষমতায়ন, যোজনা, আগস্ট, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১১।

৪৫. ক্ষেত্রসমীক্ষা, কল্পনা বাগদি, বছর ৫৭ বছর, নেকড়াছি, সাইথিয়া, বীরভূম, ৫৭ বছর, তারিখ-১৭.০৩.২০১৬

৪৬. বেনেট আর্নল্ড, আওয়ার উইমেন, ক্যাসেল অ্যান্ড কোম্পানি লিঃ, লন্ডন, ১৯২৩, পৃ. ১৪২।

৪৭. তদেব, পৃ. ১৪২।

৪৮. সেন অমর্ত্য ও অনান্য, প্রাগুক্ত,পৃ. ১১৯।

৪৯. সাক্ষাৎকার, মলু বাগদি, বয়স- ৪০ বছর, নেকড়াছি, সাইথিয়া, বীরভূম, তারিখ-১৭.০৩.২০১৬।

৫০. সেন অমর্ত্য ও অনান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।

৫১. সাক্ষাৎকার, সাবিত্রীদুলে, বয়স- ৪৮ বছর, ফুচকাপাড়া, নদীয়া, তারিখ-৭.০৮.২০১৬।

৫২. মূর্তি এন. শ্রীরমা, এমপাওয়ারমেন্ট অব উইমেন সেলফ গ্রুফস ইন ভীমাভারাম টাউন, উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট ইস্যু অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস, ডি. কে. পুল্লা রাও, দ্যা অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশার্স, দিল্লী, ২০১১, পৃ. ৬৯।

৫৩. দেশ, চুনিকটাল সংখ্যা, ৩১ অক্টোবর, ১৯৯২, পৃ. ২৩।

৫৪. দাস শকুন্তলা, আজও ওরা অন্তেবাসী- চণ্ডীমঙ্গল, ব্যাধখণ্ড ও শবরচরিত-র দর্পণে, সরকার প্রণব (সম্পাদক), স্বদেশচর্চা লোক, প্রান্তবাসী সমাজ-সংগ্রাম-সংস্কৃতি, সোনারপুর, ২০১৮, পৃ. ১৮৮।

৫৫. তদেব, পৃ. ১৮৯, ১৯৭ ও দেশ, চুনিকটাল সংখ্যা, ৩১ অক্টোবর, ১৯৯২, পৃ. ২৩।

৫৬. কোটালচুনী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৭।

৫৭. সরকার প্রণব (সম্পাদক), স্বদেশচর্চা লোক, প্রান্তবাসী সমাজ-সংগ্রাম-সংস্কৃতি, সোনারপুর, ২০১৮, পৃ. ১৫৮, ১৭০।

৫৮. জয়ন্তীসি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

৫৯. ওয়েস্ট বেঙ্গল ডেটা হাইলাইটস: সিডিউল্ডকাস্ট, প্রাগুক্ত, পৃ. ২-৪ ও মুর্মুমেরুনা, সংবিধানের সত্তর ও জাত বৈষম্য, আনন্দ বাজার পত্রিকা, ২৯.০১.২০২০।

৬০. তদেব, পৃ. ২-৪।

৬১. ঘোষ শাশ্বতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

৬২. বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী, নারী শ্রেণী ও বর্ণ, ম্যানুস্ক্রিপ্ট ইন্ডিয়া, হাওড়া, ২০০৯, পৃ. ১৯।

৬৩. ঘোষ শাশ্বতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

৬৪. জয়ন্তী সি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

"কোনও জাতির বা মানবসমাজের ইতিহাস হইতেছে, তাহার সভ্যতার ও সংস্কৃতির ইতিহাস।"

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

স্মৃতিচারণ

১

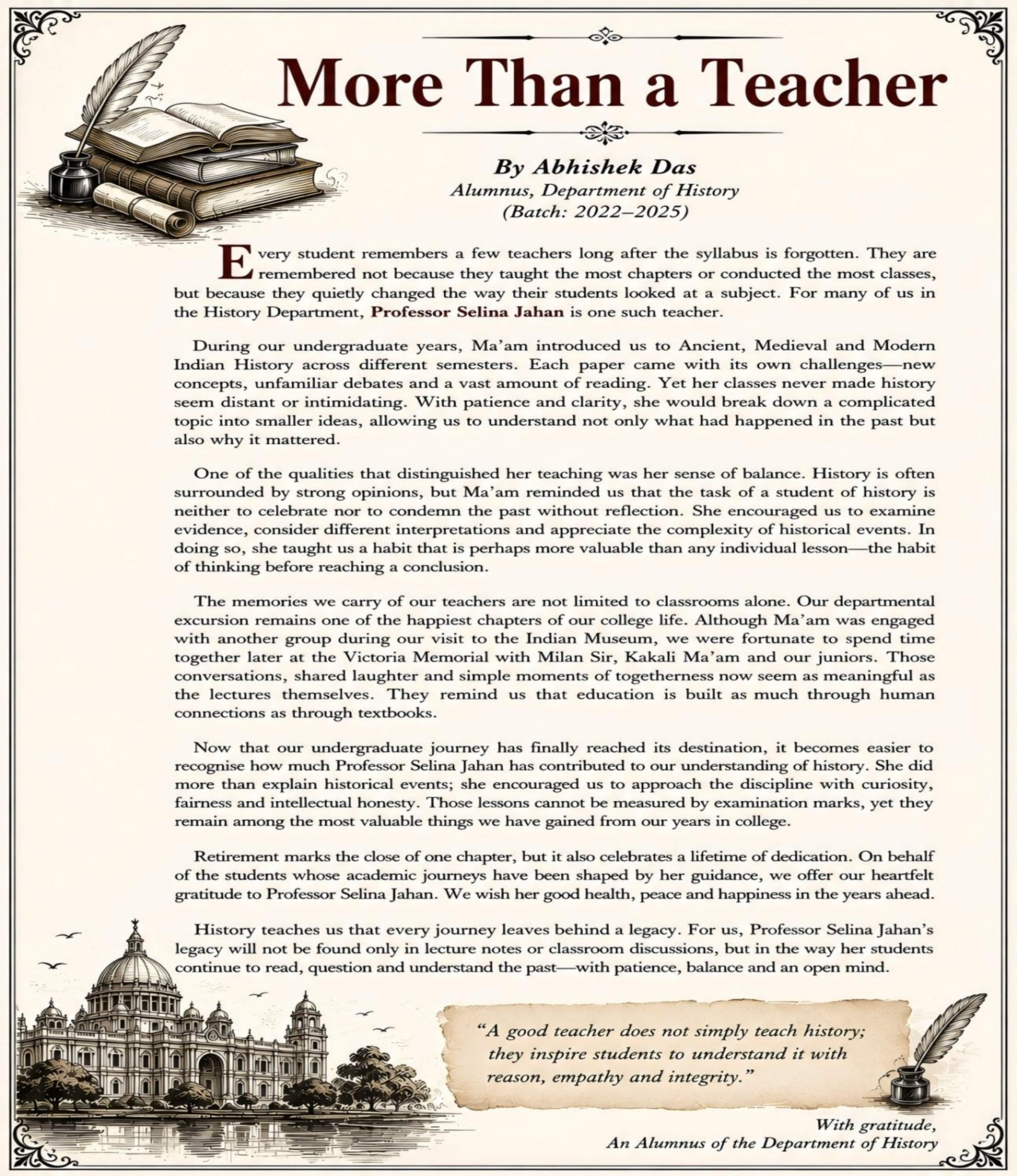

More Than a Teacher

By Abhishek Das
Alumnus, Department of History
(Batch: 2022–2025)

Every student remembers a few teachers long after the syllabus is forgotten. They are remembered not because they taught the most chapters or conducted the most classes, but because they quietly changed the way their students looked at a subject. For many of us in the History Department, **Professor Selina Jahan** is one such teacher.

During our undergraduate years, Ma'am introduced us to Ancient, Medieval and Modern Indian History across different semesters. Each paper came with its own challenges—new concepts, unfamiliar debates and a vast amount of reading. Yet her classes never made history seem distant or intimidating. With patience and clarity, she would break down a complicated topic into smaller ideas, allowing us to understand not only what had happened in the past but also why it mattered.

One of the qualities that distinguished her teaching was her sense of balance. History is often surrounded by strong opinions, but Ma'am reminded us that the task of a student of history is neither to celebrate nor to condemn the past without reflection. She encouraged us to examine evidence, consider different interpretations and appreciate the complexity of historical events. In doing so, she taught us a habit that is perhaps more valuable than any individual lesson—the habit of thinking before reaching a conclusion.

The memories we carry of our teachers are not limited to classrooms alone. Our departmental excursion remains one of the happiest chapters of our college life. Although Ma'am was engaged with another group during our visit to the Indian Museum, we were fortunate to spend time together later at the Victoria Memorial with Milan Sir, Kakali Ma'am and our juniors. Those conversations, shared laughter and simple moments of togetherness now seem as meaningful as the lectures themselves. They remind us that education is built as much through human connections as through textbooks.

Now that our undergraduate journey has finally reached its destination, it becomes easier to recognise how much Professor Selina Jahan has contributed to our understanding of history. She did more than explain historical events; she encouraged us to approach the discipline with curiosity, fairness and intellectual honesty. Those lessons cannot be measured by examination marks, yet they remain among the most valuable things we have gained from our years in college.

Retirement marks the close of one chapter, but it also celebrates a lifetime of dedication. On behalf of the students whose academic journeys have been shaped by her guidance, we offer our heartfelt gratitude to Professor Selina Jahan. We wish her good health, peace and happiness in the years ahead.

History teaches us that every journey leaves behind a legacy. For us, Professor Selina Jahan's legacy will not be found only in lecture notes or classroom discussions, but in the way her students continue to read, question and understand the past—with patience, balance and an open mind.

> *"A good teacher does not simply teach history; they inspire students to understand it with reason, empathy and integrity."*

With gratitude,
An Alumnus of the Department of History

২

More Than a Teacher

MD Sarfialam

Alumni, (2022-2025) Department of History

A very students remembers a few teachers long after the syllabus is forgotten. They are remembered not because they taught the most chapters or conducted the most classes, but because they quietly changed the way their students looked at a subject. For many of us in the History Department, Professor Selina Jahan is one such teacher. During our undergraduate years, Ma'am introduced us to Ancient, Medieval and Modern Indian History across different semesters. Each paper came with its own challenges—new concepts, unfamiliar debates and a vast amount of reading. Yet her classes never made history seem distant or intimidating. With patience and clarity, she would break down a complicated topic into smaller ideas, allowing us to understand not only what had happened in the past but also why it mattered. One of the qualities that distinguished her teaching was her sense of balance. History is often surrounded by strong opinions, but Ma'am reminded us that the task of a student of history is neither to celebrate nor to condemn the past without reflection. She encouraged us to examine evidence, consider different interpretations and appreciate the complexity of historical events. In doing so, she taught us a habit that is perhaps more valuable than any individual lesson—the habit of thinking before reaching a conclusion.

The memories we carry of our teachers are not limited to classrooms alone. Our departmental excursion remains one of the happiest chapters of our college life. Although Ma'am was engaged with another group during our visit to the Indian Museum, we were fortunate to spend time together later at the Victoria Memorial with Milan Sir, Kakali Ma'am and our juniors. Those conversations, shared laughter and simple moments of togetherness now seem as me as the lectures themselves. They remind us that education is built as much through human connections as through textbooks. Now that our undergraduate journey has finally reached its destination, it becomes easier to recognise how much Professor Selina Jahan has contributed to our understanding of history. She did more than explain historical events; she encouraged us to approach the discipline with curiosity, fairness and intellectual honesty. Those lessons cannot be measured by examination marks, yet they remain among the most valuable things we have gained from our years in college.

Retirement marks the close of one chapter, but it also celebrates a lifetime of dedication. On behalf of the students whose academic journeys have been shaped by her guidance, we offer our heartfelt gratitude to Professor Selina Jahan. We wish her good health, peace and happiness in the years ahead. History teaches us that every journey leaves behind a legacy. For us, Professor Selina Jahan's legacy will not be found only in lecture notes or classroom discussions, but in the way her students continue to read, question and understand the past—with patience, balance and an open mind.

"A good teacher does not simply teach history;
they inspire students to understand it with
reason, empathy and integrity.”

“Great teachers emanate out of knowledge, passion and compassion.”

A. P. J. Abdul Kalam

ফিরে দেখা

বিভাগীয় সেমিনার

Ananda Mohan College
One Day Seminar on "History of Science"
Organized By
Department of Mathematics & Department of History
Science & Society: Story of Europe in Transition
By
Dr. Sabyasachi Chatterjee
A Journey in the Wonderland of Quantum
By
Dr. Priyotosh Dutta
VESALII

Ananda Mohan College
One Day Seminar on "History of Science"
Organized By
Department of Mathematics & Department of History
Science & Society: Story of Europe in Transition
By
Dr. Sabyasachi Chatterjee
A Journey in the Wonderland of Quantum
By
Dr. Priyotosh Dutta
Science & Society: Story of Europe in Transition

শিক্ষামূলক ভ্রমণ

INDIAN MUSEUM
1814
EDUCATIONAL TOUR - 2024
Department Of History
ANANDA MOHAN COLLEGE
Affiliated to University of Calcutta
102/1, Raja Ram Mohon Sarani, Kolkata - 700 009

ছবিতে ইতিহাস

REDMI NOTE 9 PRO MAX
শুভম

দেবস্মিতা হোড়, প্রাক্তন ছাত্রী, ইতিহাস বিভাগ

Larka Biswas,
Sem 4, Department of History

আনন্দ মোহন কলেজ

আনন্দ মোহন কলেজ (Ananda Mohan College) কলকাতার একটি অত্যন্ত ঐতিহ্যবাহী এবং অন্যতম প্রধান সান্ধ্যকালীন (Evening) সহ-শিক্ষা কলেজ। **১৮৮১** সালে আনন্দ মোহন বসু ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ‘সিটি কলেজ’ প্রতিষ্ঠা করেন। **১৯৬১** সালে কলেজটিকে তিনটি পৃথক কলেজে বিভক্ত করা হয়—রামমোহন কলেজ (প্রাতঃকালীন বিভাগ), সিটি কলেজ (দিবা বিভাগ) এবং আনন্দ মোহন কলেজ (সান্ধ্যকালীন বিভাগ)। **২০১৭** সাল পর্যন্ত কলেজটি ‘ব্রাহ্ম সমাজ এডুকেশন সোসাইটি’র (সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ কর্তৃক গঠিত একটি সংস্থা) দ্বারা পরিচালিত হতো। এরপর থেকে এটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধীন একটি সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত কলেজে পরিণত হয়।